আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার অষ্টত্রিংশ গ্রন্থ

পরিণাম

শ্রীগুরুদাস সরকার, এম্‌-এ

আষাঢ় ১৩২৬

উপহার

পরিণাম

১

কয়েকদিন হইল সবজজ আদালতে হরেকিষণ শিউ গোলামের মোকৰ্দ্দমার শুনানি হইতেছে। বড় জেদাজেদীর মামলা, হাকিম উকিল সকলেই শশব্যস্ত। আজ টিফিনের সময় সবজজ বাবুর খাস্ কামরায় প্রথম ও দ্বিতীয় মুন্সেফ আসিয়াছেন, সরকারী উকিল বিশ্বনাথবাবুও উপস্থিত আছেন। মুচির যেমন চাম ভিন্ন চিন্তা নাই, হাকিম উকিলদিগেরও তেমনি মোকর্দ্দমা ভিন্ন কথা নাই। আজ বংশীধর দ্বিবেদীর আপিল লইয়া তর্ক চলিতেছিল। উপস্থিত হাকিমদের মধ্যে কেহ বাদীর কেহ বা বিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিয়া হাইকোর্টের বিচার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন।

বিশ্বনাথবাবু এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় বড় যোগ দেন নাই। [illegible] হইতেই আৰ্দ্দালী ডাক আনিয়াছে, তিনি খবরের কাগজখা[illegible] কর্‌তে উল্‌টা পাল্‌টা করিতেছিলেন—হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"[illegible] । করিয়া রামপ্রসন্নবাবু মারা গেছেন।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বলেন কি!" "[illegible] কি?"

হয় প'ড়ে দেখুন”—এই বলিয়া বিশ্বনাথবাবু খবরের কাগজখানি তাঁহাদের দিকে সরাইয়া দিলেন।

কাগজখানি একবারে টাট্‌কা, তখনও ছাপা কালীর সোঁদাগন্ধ ভালরূপ যায় নাই। সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে “জন্ম বিবাহ ও মৃত্যু” শীর্ষক সংবাদস্তম্ভের এক অংশে ছাপা রহিয়াছে “শ্রীমতী হিমানী মিত্র পরম শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছেন যে, তাঁহার প্রিয়তম স্বামী ছোট আদালতের জজ মিঃ রামপ্রসন্ন মিত্র গতকল্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে রাত্রি ১১৷৷০টার সময় যীশুর ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন। অদ্য বেলা ৫টার সময় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। সমাধিস্থানে বন্ধুবান্ধবগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।”

মিঃ মিত্র উপস্থিত হুজুরদিগের অনেকের সঙ্গেই একত্র কাজ করিয়াছেন। গত কয়েক সপ্তাহ হইতে কানাঘুসা চলিতেছিল যে, এ যাত্রা তাঁহার রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। তিনি আরোগ্য লাভ করিলে যে নিজ কর্ম্ম স্থলেই বাহাল থাকিবেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না বটে, কিন্তু তিনি গত হইলে তাঁহার স্থানে নীলকণ্ঠ বাবু এবং নীলকণ্ঠবাবুর স্থানে রাইচরণ রাহা বা শ্যামাপদবাবু প্রভৃতি প্রমোশন পাইবেন এ সম্বন্ধেও অল্প বিস্তর জল্পনা চলিতে-
। যাহা হউক এখন আর ছোট আদালতের জজিয়তি খালি
ন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না; সুতরাং অপর চিন্তা
। করিয়া উপস্থিত হাকিমান এই বন্ধুটির দেহত্যাগে
ভবিষ্যৎ পদোন্নতি বা বদলীর কিরূপ সুবিধা অসুবিধা
া লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

প্রথম মুন্সেফ তারকনাথ লাহা বহুদিন যাবৎ প্রথম গ্রেডে কার্য্য করিতেছেন। তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিতে লাগিলেন, "রাইচরণ বাবু বা শ্যামবাবুর পদোন্নতি হ'লে, এবার আর আমার অস্থায়ী সবজজ হওয়া কোন মতেই ফস্কাতে পারে না। এ সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রার্ সাহেব অনেক দিন হতেই ভরসা দিয়ে আস্ছেন।" সবজজ মনোহরবাবু বলিলেন—"এই সুযোগে আমার সম্বন্ধিটী যাতে হাট-হাজারী থেকে বদলী হয়, তাই নিয়ে একবার উঠে পড়ে লাগ্তে হবে। আমার স্ত্রী অনেকদিন থেকে ভাইটিকে কলিকাতায় আন্বার জন্যে ব্যস্ত আছেন; এবার হরেন্দ্র আলীপুরে বদলী হলে তাঁর আর সে মনোকষ্ট থাক্বে না; আমিও শ্বশুরবাড়ীর খোঁটার দায় থেকে রক্ষা পাব। আজকাল শ্যালিকা মহাশয়ারা সুবিধা পেলেই বলে থাকেন যে, তাঁদের প্রতি আমার নাকি একটুও দৃষ্টি নাই।"

বিশ্বনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিঃ মিত্রের হয়েছিল কি?" সবজজবাবু বলিলেন—"ব্যারামটা যে কি তা কেউই ঠিক কর্তে পারে নি। এক রকম বৈদ্যশঙ্কট হয়েছিল বল্লেও হয়। শেষবার যখন আমার সঙ্গে দেখা হয়, তখন যেন একটু সেরে উঠ্ছিলেন বলে মনে হয়েছিল।" প্রথম মুন্সেফবাবু বলিলেন—"গত ইষ্টারের পর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। দেখা কর্তে যাব মনে করেছিলাম, এমন সময় এই—"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই দ্বিতীয় মুন্সেফ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—"বিষয় সম্পত্তি কি রকম রেখে গ্যাছেন জানেন কি?"

মনোহরবাবু বলিলেন—"তাঁর স্ত্রীর হাতে কিছু আছে শুনেছি, ভাবে বোধ হয় বড় বেশী নয়। এ সময় একবার মিসেস্ মিত্রের সঙ্গে দেখা না করাটা বড় ভাল দেখায় না। তাঁদের বাড়ী আবার যে দূরে, কোথায় সেই বালীগঞ্জ—দুটাকার কমে একখানা থার্ড ক্লাস গাড়ীও পাওয়া যায় না।"

বিশ্বনাথবাবু বলিলেন—"আপনি যে সৃষ্টিছাড়া জায়গায় বাসা নিয়েছেন, সেখান থেকে কোন্ জায়গাটাই বা কাছে হয়?" সবজজবাবু বলিলেন—"আমি খাল পারে বাড়ী ভাড়া করেছি বলে আপনারা আমাকে যেন একঘরে করিতে পারিলে বাঁচেন।" এই বলিয়া হাসিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বলা বাহুল্য সবজজ মহাশয় অযথা অর্থ ব্যয়ের বড়ই বিরোধী। সেই জন্য কলিকাতার ধোঁয়া ও ট্রামের ঝনঝনানির অজুহাতে নারিকেল-ডাঙ্গার নিকট কোনও নিরালা পল্লীতে সুবিধায় একখানি দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়াছেন। সেখান হইতেই কষ্টে সৃষ্টে কাছারী করেন এবং কোনও দিন সকাল সকাল কাজ সারিতে পারিলে, প্রথম বা দ্বিতীয় মুন্সেফের বাসায় "ব্রিজ" খেলিয়া যান। এই অল্প দিনের মধ্যেই "ব্রিজ" খেলা ছোকরা মহল অতিক্রম করিয়া তাস-বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধদিগের মধ্যেও যে কিরূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা বোধ হয় ভদ্র-সমাজে অবিদিত নহে।

এদিকে মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে বদলী ও পদোন্নতি লইয়া সহকর্ম্মিগণের মধ্যে যেরূপ একটা হৈ চৈ লাগিয়া গেল, তাঁহার বেসরকারী বন্ধুগণের মধ্যে ঠিক সেরূপ না ঘটিলেও, কতক হাঁফ

খাইতেছেন না?" এই বলিয়া ভৃত্যের নিকট গোরস্থানের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জমির দরদাম সম্বন্ধে আবশ্যক সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মনোহরবাবু চুরুট টানিতে টানিতে উভয়ের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মনোনীত অংশেই জমি খরিদ সাব্যস্ত হইয়া গেল। শবাধার সমাহিত করার সময় লোকজনের কিরূপ আবশ্যক হইবে, মিত্র-গৃহিণী সে-সম্বন্ধে ভৃত্যকে উপদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত বন্দোবস্ত সারিয়া ফেলিতে বলিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। মিত্র-গৃহিণী সবজজবাবুর দিকে কয়েকখানি ছবির অ্যাল্‌বাম সরাইয়া দিয়া বলিলেন—"দেখ্‌ছেন তো, এ অবস্থায়ও আমাকে সংসারের খুঁটি নাটি সব দেখ্‌তে হচ্ছে।" ইতিমধ্যে সবজজবাবুর চুরুটের ছাই টেবিলের আস্তরণের উপর পড়িবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া তিনি ছাই ফেলা ক্ষুদ্র 'ট্রে'টি তাঁহার দিকে সরাইয়া দিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"দেখুন—অনেকেই বলে শোকের সময় কোন কাজেই মন লাগে না। আমি কিন্তু দেখ্‌ছি কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই বরং কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যায়। প্রিয় জনের আত্মার কল্যাণে নিজ কর্ত্তব্যে মন দিলে দুশ্চিন্তার ভার যেন আপনা থেকেই কমে আসে।"

কথা কয়টি বলিতে বলিতে মিসেস্ মিত্র বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু রুমাল বাহির করিয়াও এবার আর চোখে দিলেন না, শুধু কিঞ্চিৎ মুখ বিকৃত করিয়াই যেন দৃঢ় ভাবে চোখের জল আটকাইয়া লইলেন।

অল্প ক্ষণ পরে মিসেস্ মিত্র কহিলেন—"শেষের ক'দিন তিনি কি কষ্টই না পেয়েছিলেন।"

সবজজবাবু। তাঁর যন্ত্রণা কি বড় বেশী হয়েছিল ?

মিসেস্ মিত্র। সে যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা তা আর বল্‌বার নয়। মৃত্যুর তিন দিন আগে থেকে শুধু ২৪ ঘণ্টা চীৎকার করেছিলেন। ক্রমাগত এত যন্ত্রণা কি করে যে তিনি বরদাস্ত করেছিলেন, তা বল্‌তে পারিনে। তাঁর চীৎকার দু'তিন বাড়ী তফাৎ থেকেও শোনা যেত। আমাকে যে কি ভোগটাই ভুগ্‌তে হয়েছে, একবার বুঝে দেখুন।

সবজজবাবু। সে অবস্থাতেও তাঁর জ্ঞান ছিল কি ?

মিসেস্ মিত্র। হ্যাঁ, জ্ঞান শেষ পর্য্যন্তই ছিল। মৃত্যুর প্রায় মিনিট ১৫ আগে তিনি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আর বড় খোকা সুধীরকে বাইরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

যাহার সহিত বাল্যকালের দুরন্তপনা হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোরের বিদ্যাভ্যাসে এবং প্রৌঢ়াবস্থায় কর্ম্মক্ষেত্রের সহযোগিত্বে অনেক সময় কাটাইতে হইয়াছে, তাঁহার শেষ সময়ের যন্ত্রণার কথা শুনিয়া কাহার না মনে আঘাত লাগে ? সবজজবাবু মানসচক্ষে মৃত্যুর সেই শেষ দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন ; সেই বিবর্ণ দেহ, সেই ওষ্ঠসংস্পর্শী নাসা সমস্তই তাহার নিকট যেন প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতেছিল। নিজ পরমায়ুর অনিশ্চয়তার কথা মনে করিয়া হঠাৎ তিনিও মৃত্যুভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, তিন চারি দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যু যে

আমার অদৃষ্টেই লেখা নাই তাহাই বা কে বলিল। সে সাংঘাতিক পীড়া যে কোনও মুহূর্ত্তে আমারও ত হইতে পারে। এ চিন্তায় তাঁহার শুষ্ক হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু এ চিত্তবিপ্লব ক্ষণিকমাত্র! পরমুহূর্ত্তে আপনা হইতেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "রামপ্রসন্নের অদৃষ্টে এরূপ হইয়াছে বলিয়া আমারও যে হইবে তাহার মানে কি? আমার কোষ্ঠিতে ত এরূপ রোগ-ভোগের কথা লেখা নাই, তবে মিছামিছি মন খারাপ করি কেন? আমাকেও দেখিতেছি রমণবাবুর মত হইতে হইবে। তাহার এ সব বালাই নাই—সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি! কৈ রমণকে তো কখনও বিষণ্ণ হইতে দেখি না।" তুলনামূলক বিচার বুদ্ধি যে কিরূপে তাঁহার মনে এত সত্বর শান্তি আনিয়া দিল, তাহা সবজজবাবু নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মনোহরবাবু এখন স্থির চিত্তে বন্ধুর মৃত্যুকালীন অবস্থার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সবজজবাবুকে স্বামীর মৃত্যুশয্যার বৃত্তান্ত সবিস্তারে শুনান হইলে মিসেস্ হিমানী মিত্র মনে করিলেন, আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া কাজের কথা পাড়া উচিত। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে করুণরসাত্মক ভূমিকা না হইলে যে সব মাটি! সুতরাং পুনরায় নিজের দুঃখ জ্ঞাপন করিতে করিতে তিনি অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন, বেগে অশ্রুবর্ষণ ও সেই সঙ্গে রুমাল সহযোগে ঘন ঘন নাসিকা ঘর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

মনোহরবাবু একবার সহানুভূতিজ্ঞাপক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতেই মিত্রজায়া নিজ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট

বিষয়টি বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কথাটা আর কিছুই-নয়, সরকারী প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ও মৃত কর্ম্মচারিগণের পারিবারিক সাহায্য ফণ্ডের টাকা ব্যতীত, বিশপ সাহেবের সহি সুপারিশ লইয়া আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনও কিছু টাকা পাওয়া যাইতে পারে কিনা, এবং এ সম্বন্ধে কিরূপ যোগাড় যন্ত্র আবশ্যক, ইহাই তাঁহার জিজ্ঞাস্য।

মনোহরবাবু কথায় বার্ত্তায় বুঝিতে পারিলেন যে, এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা মিসেস্ মিত্র ভালরূপই জানিয়া লইয়াছেন—এখন তাঁহার নিকট শুধু একবার "পর্ তাল" দিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র। এমন কি গবর্ণমেণ্ট হইতে কিরূপ জবাব পাওয়া সম্ভব, ইহাও তাঁহার অবিদিত নাই। সবজজবাবু ভাবিয়া দেখিলেন, এ যুদ্ধের বৎসরে এ চেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য; সুতরাং তিনি কোনরূপ বৃথা আশা না দিয়া কেবল উপরিতন কর্ম্মচারীদিগের দৃষ্টিকার্পণ্য ও অবিচারের উল্লেখে বহুবিধ কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মিসেস্ মিত্র যেন নৈরাশ্যের ভাব দেখাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি অবসর গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতেছেন বুঝিতে পারিয়া সবজজবাবু চুরুটের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বন্ধুপত্নীকে নমস্কার করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।

পার্শ্বের বড় ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া মনোহরবাবু দেখিলেন, খাবার টেবিল পূর্ব্বের ন্যায় সাজান রহিয়াছে এবং সেই স্থূল দেহ

পাদরী সাহেবটি সেখানে দাঁড়াইয়া কয়েক জন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। মিত্র সাহেব একবার নিলামে সস্তায় একটি সুন্দর ঘড়ি খরিদ করিয়াছিলেন। ঘড়িটি পূর্ব্বেরই মত টিক্ টিক্ শব্দে চলিতেছিল। এই সময়ে মিত্র সাহেবের একটি বয়স্থা কন্যা, তাঁহার ভাবী স্বামীর সহিত প্রার্থনায় যোগদান করিলেন। সুন্দরী ও তন্বঙ্গী মেয়েটির আঁধার পানা মুখের ক্রুদ্ধ কৃতসংকল্প ভাব দেখিয়া সহজেই মনে হইতেছিল যে পিতার মৃত্যুতে শোকের চেয়ে যেন তাঁহার রাগের ভাগটাই অধিক হইয়াছে। তাঁহার হবু স্বামী একজন নবীন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তখনও "প্রবেসনারী" ডিম্বত্ব ভেদ করিয়া "সব্ প্রোটেম্" রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন নাই। সবজজবাবুকে দেখিয়া তাঁহার অপ্রসন্ন মুখ যেন আরও অপ্রসন্ন হইল। কুমারী মিত্র একটি নামমাত্র নমস্কার করিয়া বিষ-দিগ্ধ দৃষ্টিতে কয়েকবার পিতৃবন্ধুর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। সবজজবাবু উভয়ের নিকট এরূপ অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা পাইয়া যেন হতভম্ব হইয়া গেলেন এবং হতাশভাবে উভয়কে প্রত্যভিবাদন করিয়া মৃতের ঘরের দিকে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার বন্ধুর একমাত্র পুত্র একটি ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক একাকী সেই ঘরে প্রবেশ করিতেছে। ছেলেটিকে দেখিয়া রামপ্রসন্নের বাল্যকালের মূর্ত্তি তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইল। সেই রূপ, সেই আকার অবয়ব, ঠিক সেইরূপ চাহনি। এ বয়সে রামপ্রসন্ন ও তিনি একত্রেই স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। কাঁদিয়া ছেলেটির চক্ষু ফুলিয়া

উঠিয়াছিল। সবজজবাবু নিনিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সবজজবাবু দেখিলেন বালকের মুখেও যেন ক্ষোভ ও বিরক্তির চিহ্ন বিদ্যমান। তিনি আর তাহার সহিত কথা না কহিয়া সামান্য ঘাড় নাড়িয়াই মৃতদেহের নিকট চলিয়া গেলেন।

ক্রমে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হইল। চারিদিকে মোমবাতির আলো, ধূপধূনার গন্ধ ও সেই সঙ্গে নিরন্তর অশ্রুপাত ও অস্ফুট ক্রন্দন। মিত্র মহাশয় রোমান কাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন বলিয়া যথাযোগ্য আড়ম্বরের অভাব ছিল না।

সবজজবাবু অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই কান্নাকাটির ভিতর পাছে তাঁহার মন খারাপ হয়, সেই ভয়ে মৃতদেহের দিকে তিনি আর ফিরিয়াও দেখিলেন না।

অল্পক্ষণ মাথা নীচু করিয়া নিজের জুতার ডগার দিকে তাকাইয়া, সর্ব্বাগ্রেই সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ভৃত্য তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার ছড়ি ও টুপি আনিয়া দিল। সবজজবাবু বলিলেন—"কি হারাধন, তুমিও যে বড় শোক পেয়েছ দেখ্ছি।"

কথা কয়টি বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু নিঃশব্দে চলিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না বলিয়া এইরূপ "আদিখ্যেতা" করিতে হইল। হারাধন নেহাৎ পল্লীগ্রামের চাষী শ্রেণীর লোক, সভ্যতার মারপেঁচ সে বড় বেশী জানিত না; তাই সরলভাবে বলিল—

"কর্ত্তা, মোদের খ্যামতা কি যে আটকে রাখি, আর কাঁদাকাটি করেই বা করি কি, সবারই ত সেই এক রাস্তা।" এই ভৃত্যটিকে এইরূপ ধীরতার সহিত উত্তর দিতে দেখিয়া সবজজ মহাশয় কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কথা কহিবার সময় ওষ্ঠের ফাঁক দিয়া হারাধনের ধপ্‌ধপে দাঁতের সারি মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইতেছিল। দাঁতগুলি বেশ দৃঢ়সম্বদ্ধ। দেখিয়াই মনে হয় এ দাঁত দিয়া নারিকেল টানিয়া ছাড়াইলেও কোনও ক্ষতি হইবে না।

হারাধন কোচম্যান্‌কে ডাকিয়া দিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল এবং পাছে সবজজবাবু ভুলক্রমে কোনও জিনিষ ফেলিয়া যান, সেইজন্য তাড়াতাড়ি হলঘরটি পুনরায় দেখিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে সবজজ মহাশয় গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ুসেবনে কিঞ্চিৎ সুখ বোধ করিলেন—গাড়োয়ান্‌কে হাঁকিয়া বলিলেন—"ভবানীপুর কাঁসারীপাড়া চল্‌।" আর্‌দালী গাড়োয়ানের পার্শ্বে বসিয়াছিল, তাহাকে বলিয়া দিলেন—"বুঝলি তো রে, প্রথম মুন্সেফ বাবুর বাসায়।" সবজজবাবুকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া পস্তাইতেই হইল না; তিনি প্রথম ক্ষেপ্‌ শেষ না হইতেই খেলায় যোগ দিতে পারিলেন।

২

বাহিরের দিক হইতে রামপ্রসন্ন মিত্র মহাশয়ের জীবন কাহিনী আপাত-মনোরম বলিয়া বোধ হইলেও উহার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ। মিত্র মহাশয় ৪৫ বৎসর বয়সে ছোট আদালতের

জজিয়তী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দুনিয়াদারী ফোত করিলেন। তাঁহার পিতা একজন নামজাদা সরকারি কর্ম্মচারী। ডেপুটি হরিপ্রসন্ন মিত্রের নাম পূর্ব্বেকার সিবিলিয়ান মহলে অনেকেই ভালরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন যে জরাগ্রস্ত হইয়া সর্ব্ববিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে অপারক হইলেও তাঁহাকে পেন্সন লইতে বাধ্য করান হয় নাই। সে আমলে প্রাচীন কর্ম্মচারিগণের বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ প্রায়ই তাঁহাদিগকে কর্ম্মবিরল পদে বাহাল রাখা হইত। এইরূপে জীবন সায়াহ্নে জরদ্গব অবস্থাতেও বিনা আয়াসে তাঁহাদের পূরা বেতন লাভ ঘটিত। হরিপ্রসন্ন নকলনবীশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের কোন সুবৃহৎ জেলার সদর ষ্টেসনে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং অনাবশ্যক পঞ্চম চক্রের ন্যায় মনোনীত সদস্যরূপে জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনবিভাগের মন্দগতি শকটগুলির বেগ আরও মন্দীভূত করিয়া বহুকাল নিজপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হরিপ্রসন্নের তিন পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সত্যপ্রসন্ন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাদেশিক শাসনবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে পুত্র আবকারী ডেপুটি কালেক্টার রূপে বহুদিন কার্য্য করায় হাল ব্যবস্থায় ৫০০৲ টাকা বেতনে আবকারী সুপারিন্টেণ্ডের পদে নিযুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোটায় পঁহুছিয়াছে, সুতরাং আর অধিক উন্নতির আশা নাই। সর্ব্বকনিষ্ঠ জ্ঞানপ্রসন্ন বাল্যকালেই

বয়াটে হইয়া যায়। তাহাকে ৫।৬ বার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাকরী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সে কোথাও টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। এখন অগতির গতি রেলবিভাগে সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কোনও প্রকারে নিজ উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। তাহার পিতা ও ভ্রাতারা বিশেষতঃ তাহার ভ্রাতৃবধূরা তাহাকে বড় নিকটে ঘেঁসিতে দিত না, এমন কি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তাহার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিত না। হরিপ্রসন্নের একমাত্র কন্যার বড় ঘরেই বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুরের ন্যায় জামাতাও ডেপুটি ছিলেন। উপযুক্ত পুত্র ও উপযুক্ত জামাতা কখনই সমতুল্য নহে, সুতরাং মিত্রপরিবারের একমাত্র আশা ভরসার কেন্দ্র, কুলপ্রদীপ মধ্যম রামপ্রসন্নের প্রতি সকলেরই সোৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। জ্যেষ্ঠের ন্যায় রামপ্রসন্নের বৃথা পাণ্ডিত্যের ভাণ ছিল না এবং তিনি বৃথা বাগাড়ম্বরও ভালবাসিতেন না। অপর দিকে, চঞ্চলমতি কনিষ্ঠের ন্যায় তিনি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য আমোদপ্রিয় যুবক মাত্রও ছিলেন না। শিষ্ট, সুচতুর ও তেজস্বী বলিয়া সকলেই এই প্রিয়দর্শন যুবককে ভালবাসিত। রামপ্রসন্ন সসম্মানে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আইন বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তাঁহার, যেরূপ স্বভাব ছিল পরে তাহার আর বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সারাজীবন তিনি সেই একই প্রকার সখা-সঙ্গ-লিপ্সু, সদানন্দ, রহস্যপ্রিয় ব্যক্তিরূপে কাটাইয়া গিয়াছেন। এদিকে খোস মেজাজী বলিয়া বন্ধুসমাজে তিনি যেরূপ আদৃত ছিলেন, কর্ম্মঠ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া রাজসরকারেও তাঁহার

সেইরূপ সুখ্যাতি ছিল। তিনি দৃঢ়তার সহিত নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন কিন্তু সে কর্ত্তব্যের গণ্ডি বড়ই সঙ্কীর্ণ। উপরিস্তন কর্ম্মচারীরা কাগজে কলমে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন, তাহাই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তোষামোদ করিয়া তিনি কখনও নিজ কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতেন না। তোষামোদকারিগণকে তিনি বাস্তবিকই অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বড়লোকদিগের সহিত বেমালুম ভাবে মিশিবার ও তাঁহাদের আচার অভ্যাস, সখ ও আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি নিজস্ব করিয়া লইবার তাঁহার এক অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। উজ্জ্বল আলোক দৃষ্টে উদ্‌ভ্রান্ত পতঙ্গের ন্যায় তিনি ধনী সমাজের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যৌবনের পিচ্ছিল পন্থা অতিক্রম করিলেও তিনি এ যাবৎ মনসিজের পূজা হইতে বিরত হয়েন নাই। কিন্তু এখন আর বাহ্যিক ব্যবহারে কৈশোরসুলভ চাপল্যের লক্ষণ কিছুমাত্র বিদ্যমান ছিল না বলিয়া সেদিকে কাহারও দৃষ্টি সহসা আকৃষ্ট হইত না। বয়োবৃদ্ধি ও পদোন্নতির সহিত তাঁহার মতবাদও ক্রমশঃ উদারনৈতিক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িতেছিল। 'ল' কলেজে অধ্যয়ন কালে বয়সসুলভ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কয়েকবার লজ্জাস্কর কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং এজন্য পরে তাঁহার যথেষ্ট আত্মগ্লানিও উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ধনী সংসর্গে আসিয়া দেখিলেন যে এরূপ নৈতিক পদস্খলন তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে সুতরাং অনুশোচনার বেগ শীঘ্রই মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। ইহার পর এরূপ

কার্য্যের সমর্থন-প্রয়াসী না হইলেও তিনি এগুলি আর সেরূপ দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

'ল' কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইতেই রামপ্রসন্ন তাঁহার পিতৃবন্ধু একজন হাইকোর্টের উকিলের নিকট নামমাত্র আর্টিক্লড্ ক্লার্করূপে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল এবং রামপ্রসন্নও ইত্যবসরে এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ও ঠাকুর আইন পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় স্বুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়া হাসিমুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ওকালতীর উপর রামপ্রসন্নের বিশেষ আস্থা ছিল না এবং বৃদ্ধ হরিপ্রসন্ন উপস্থিত চাকরীর বাজারে পুত্রের জন্য অপর কিছু সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাহাকে ১০০৲ টাকা বেতন ও ৫০৲ টাকা ভাতায় গ্রেড্ বহির্ভূত সরকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীর পদে বাহাল করাইয়া সরেজমিনে কার্য্যশিক্ষার জন্য মফঃস্বলে পাঠাইয়া দিলেন। রামপ্রসন্নের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও অবস্থানুযায়ী বেশভূষার প্রতি তাঁহার পিতার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। চাকরীর স্থানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে রামপ্রসন্ন পিতৃদত্ত অর্থে প্রবাসোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তখনও ডেপুটি মহলে এরূপ সাহেবীয়ানার প্রাদুর্ভাব হয় নাই, কিন্তু খৃষ্টান বলিয়া মিত্র পরিবারে সাধারণতঃ সাহেবী পোষাকই ব্যবহৃত হইত। রামপ্রসন্ন ব্যয়বাহুল্য সত্ত্বেও সাহেব বাড়ী হইতে পোষাক তৈয়ার করাইলেন ও কয়েকদিন চৌরঙ্গীর ভিন্ন ভিন্ন সাহেবী দোকানে ঘুরিয়া নূতন সুট কেস, টুপির বাক্স, সুদৃশ্য বিলাতি কম্বল, সাবান, ক্ষুর ও ষ্ট্রপ (strop) প্রভৃতি হাজামতের

সরঞ্জাম এবং ল্যাটিন মটো সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র লকেট খরিদ করিয়া ফেলিলেন। লকেটটী দেখিতে সুন্দর ছিল না কিন্তু মটোটি রামপ্রসন্নের বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। উহার ভাবার্থ কেনাকাটির হাঙ্গাম মিটাইয়া গেলে পূর্ব্ব সহপাঠিগণ "স্বাভীষ্টং সাধয় নিত্যং"। সকলে মিলিয়া ঘটা করিয়া রামপ্রসন্নকে বিলাতি হোটেলে একদিন "ডিনার" দিলেন। বিদায় ভোজনান্তে রামপ্রসন্ন রাত্রির ট্রেণে কার্য্যক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে অপর অপর সহকর্ম্মীদিগের সহিত একরূপ পাঠ্যাবস্থার ন্যায় আমোদ আহ্লাদেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। রামপ্রসন্ন সরকারী কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন এবং যাহাতে পদমর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয় এরূপ আমোদ প্রমোদে কদাচ সাধারণ ভাবে যোগ দিতেন না। ফলে তাঁহার উপরওয়ালারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদোন্নতির জন্য রিপোর্ট দিতে লাগিলেন। উপরিস্তন ও অধস্তন কর্ম্মচারিগণের সমক্ষে আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কাজ হাসিল করিতে তিনি ভালরূপেই শিখিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম তামিল করিতে মধ্যে মধ্যে সদর ষ্টেশনে যাইতে হইত। খৃষ্টিয় মুণ্ডাগণের জমী লইয়া কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে তিনিই স্থানীয় তদন্তের জন্য প্রেরিত হইতেন এবং সকল স্থলেই উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করিয়া যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার সততার জন্য সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল এবং উৎকোচাদির বশীভূত নহেন বলিয়া এ সম্বন্ধে তিনি

নিজেও যে একটু স্পর্দ্ধা না করিতেন তাহা নহে। তাঁহার অল্প বয়স ও আমোদপ্রিয়তা সত্ত্বেও সরকারী কার্য্যের সময় সকলেই তাঁহাকে বেশ রাশভারি এমন কি কড়া লোক জানিয়াই সমিহ করিয়া চলিত। সেবার সেটেলমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত সাহেব মহাশয় সস্ত্রীক ক্যাম্পে শুভাগমন করিয়াছিলেন। রামপ্রসন্নের বিনয়, কার্য্যতৎপরতা ও আদবকায়দার গুণে উভয়েই এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কয়েকবার দেশীয় খৃষ্টান রামপ্রসন্নকে ডিনারে সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেটেলমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় ও তাঁহার মেম সাহেবের সহিত এই সৌহার্দ্দ্য ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তিনি প্রাণপণে তাঁহাদের সন্তোষ বিধানে নিযুক্ত রহিলেন। সামাজিক ব্যাপারে তাঁহার মেশামিশি ও চলাফেরার ভঙ্গীতে কেহই কণামাত্র দোষ ধরিতে পারিত না। তিনি যাহাই করুন না, তাঁহার মধুর ব্যবহারের গুণে সকলেই তাঁহার দোষ উপেক্ষা করিত। হাজার গোলযোগ সত্ত্বেও তাঁহার বেশভূষার পারিপাট্যের লাঘব হইত না। রাজদ্বারে ও সভাসমিতিতে বিশুদ্ধ ইংরাজী ছাড়া তিনি কখনও দেশীয় বা মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করিতেন না। এইরূপে চাকরীর তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

সেটেলমেণ্ট কার্য্য শেষ হইবার মুখে রামপ্রসন্ন নিজ দক্ষতাগুণে ও সরকার বাহাদুরের অনুগ্রহে সব ডেপুটি পদে নিযুক্ত হইলেন। সব ডেপুটিদিগকে অল্পবিস্তর বিচারের কার্য্যও করিতে হয় বিশেষতঃ মহকুমায় থাকিলে ত কথাই

নাই। মিত্র মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন এক ঘেয়ে জরীপাদি সংক্রান্ত কাজের পর এই নূতন কর্ত্তব্যগুলি নেহাৎ মন্দ লাগিবে না তাই নূতন পদে বাহাল হইবার পর সাধারণবিভাগে বদলীর হুকুম আসিলে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। যাইবার সময় তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে ষ্টেশনে পৌঁছাইতে আসিলেন এবং স্মরণচিহ্নস্বরূপ ঢাকাই কারিকরের তৈয়ারী নাম খোদাই করা একটি রূপার সিগারেট কেস্ এবং চন্দন কাঠের ফ্রেমে বাঁধান একখানি গ্রুপ ফটোগ্রাফ ঠিক ট্রেণ ছাড়িবার সময় উপহার দিলেন। তখন আর মৌখিক আপত্তি করিবার বা ধন্যবাদ দিবারও অবসর ছিল না।

সেটেলমেণ্ট কার্য্যে রামপ্রসন্ন যেরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন বিচার কার্য্যেও তাঁহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। বরং এ ক্ষেত্রে পদটি তাহার মনের মত হওয়ায় ক্রমশঃ কাজের উপর যেন একটু বেশী অনুরাগই দেখা যাইতে লাগিল। কর্ত্তব্য ও সামাজিক শিষ্টাচারের সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি অর্থী প্রত্যর্থী ও উকিল মোক্তারগণের সহিত এরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন যে সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যশোগান করিত। পূর্ব্বে সেটেলমেণ্ট তাম্বুতে নায়েব, সব্ ম্যানেজার প্রভৃতি যে সকল প্রতিপত্তিশালী লোকের সহিত জানাশুনার সুবিধা হইত এখন তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত মিশিবার সুযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। পিতা ও ভ্রাতাকে দেখিয়া বাল্যকাল হইতে "হাকিমি করার" যে একান্ত অভিলাষ মিত্রজার মনের কোণে লুকায়িত ছিল

এ ক্ষেত্রে সে দুধের তৃষ্ণা কোনপ্রকারে ঘোলেই মিটাইতে হইল ? কাছারীতে রামপ্রসন্ন যেটুকু কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছিলেন তাহাতেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এক একবার মনে মনে ভাবিতেন যত বড় ধনী লোকই হউন না কেন একখানি সাদা, ফরমে নাম দস্তখৎ করিয়া পাঠাইলেই এজলাসে আসিয়া হাজির হইতে হইবে। তাঁহার এক মাসের অধিক কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা ছিল না বটে কিন্তু সাক্ষীর কাটগড়ায় খাড়া করাইয়া ইচ্ছামত প্রশ্ন করিবার ক্ষমতাও ত নিতান্ত কম নহে। রামপ্রসন্নের একটী মহৎ গুণ ছিল ; নিজ ক্ষমতা সামান্য হইলেও তিনি কখনও তাহার অপব্যবহার করিতেন না। কোথাও বাধ্য হইয়া কর্কশ ব্যবহার করিতে হইলেও তিনি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া যাহাতে সব দিক বজায় থাকে এইরূপ ব্যবস্থাই ভালবাসিতেন। তাঁহার যে দণ্ড দিবার ক্ষমতা আছে এবং ইচ্ছা হইলে তিনি যে রাজদ্বারে অনাবশ্যক কঠোরতা বর্জ্জন করিতে পারেন বিচারকার্য্যের এই বিশেষত্ব টুকুই তাঁহার নিকট সমধিক প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত। সাক্ষীর এজাহার গ্রহণকালে মিছামিছি অনাবশ্যক বিষয় লিখিয়া তিনি কখনও নথি ভারাক্রান্ত করিতেন না। রায় লেখা সম্বন্ধেও তাঁহার একটু বিশেষত্ব ছিল। হাজার জটিল মোকর্দ্দমা হইলেও তিনি উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে আবশ্যক অংশ লইয়া এরূপ সরল ভাষায় বৃত্তান্তটী বর্ণনা করিতে পারিতেন যে নিজের ব্যক্তিগত মতামতের উপর বিশেষ জোর না দিলেও ইহাতেই সত্য ঘটনা আমূল প্রকাশ পাইত। প্রথম হইতেই

মোকর্দ্দমাটি সত্য বা মিথ্যা এরূপ একটা ধারণা না করিয়া ক্রমশঃ প্রশ্নের দ্বারা তিনি সকল কথা পরিষ্কার করিয়া লইতেন। পরে সাক্ষীগণের পরস্পর বিরুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে কোন্ কয়টি ঘটনা সংযোজনা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় তাহাই নিজ রায়ে প্রকাশ করিতেন।

নূতন কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি অল্পদিনেই অনেকগুলি নূতন বন্ধু ও নূতন সহচর লাভ করিলেন। এখনও পূর্ব্বের ন্যায় ভালরূপ বেশভূষা করিতেন, তবে এ বিষয়ে সামান্য একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তিনি দাড়ি কামান বন্ধ করিয়া দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমে এজন্য অনেকে ইহা ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণ বলিয়া ইঙ্গিত করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামপ্রসন্নের কোন ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত পরিচয় ছিল না এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী বিধায়ে আচার ব্যবহারেও ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার কোনও রূপ সহানুভূতি লক্ষিত হইত না। তিনি কেবল মুরুব্বি সাজিয়া গম্ভীর হইবার অভিপ্রায়েই দাড়ি রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মহকুমায় বেশ আনন্দেই দিন কাটিতে লাগিল। নূতন সঙ্গিগণ সকলেই সদাশয় ও সজ্জন ব্যক্তি এবং ইতিমধ্যে তাহার মাহিনাও পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এ ছাড়া "ব্রিজ" নামক নূতন তাস খেলা আরম্ভ করিয়া তিনি মনুষ্য জীবনে অভিনব আনন্দ রসের সঞ্চার অনুভব করিতে লাগিলেন। এ খেলায় তিনি বাস্তবিকই পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। খেলিতে বসিলে তাঁহাকে কদাচিৎ হারিয়া উঠিতে দেখা যাইত।

ছাড়ার ভাব যেন বেশ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছিল। তাঁহাদের অনেকেরই ভাবটা যেন "মর্‌তে হয় সেই মরেছে, আমাদের ত আর মর্‌তে হয়নি। এখন অন্ততঃ রোগশয্যায় হাজিরা দেওয়ার দায় থেকেত নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।"

মনোহরবাবুর সহিত মিত্র সাহেবের, বড়ই বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা উভয়ে বাল্যবন্ধু, ল-ক্লাস অবধি সহপাঠী ছিলেন এবং সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়াও মনোহরবাবু অনেকবার জটিল আইনের তর্কসম্বলিত মোকর্দ্দমার সুবিচার সম্বন্ধে তাঁহার নিকট যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছেন। সবজজবাবু বাসায় ফিরিয়া গিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ জানাইলেন; এবং সেই সূত্রে শ্যালকের বদলীর চেষ্টা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া তাড়াতাড়ি জলযোগ সারিয়া লইলেন। সে দিন আর তাঁহার বিশ্রাম করা হইল না। অনেক দর কসাকসির পর নিতান্ত লক্ষী-ছাড়া গোছ একখানা ছক্কড় ভাড়া করিয়া, "মন একা আসা একা যাওয়া একার কর ভাবনা" পরমার্থতত্ত্বসম্বলিত এই পদটি গুণ গুণ স্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে সদরালা মহাশয় একাই মৃত সহযোগীর গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পঁহুছিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। গাড়ী গেটের নিকট আসিতেই সবজজবাবু দেখিতে পাইলেন, আরও তিনখান ভাড়াটিয়া গাড়ী বাড়ীর বাহিরে সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার তখনও বিলম্ব আছে বুঝিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, কারণ নগদ দেড়মুদ্রা খরচের পরও সময় মত উপস্থিত না হইতে পারিলে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইত

সন্দেহ নাই। সম্মুখের ঘরে মূল্যবান্ গৃহ সজ্জাদির মধ্যেই শবাধারের ডালাটি ঠেস্ দিয়া রাখা হইয়াছে। উহার চারিধার কালো রেশমী ফিতায় মোড়া—গায়ে লতাপাতা কাটা একখানি চতুষ্কোণ পিত্তলখণ্ড লাগান। তাহাতে মিত্র সাহেবের নাম ও তাঁহার মৃত্যুর তারিখ খোদাই করা রহিয়াছে।

সদর দরজার পার্শ্বে দুইজন বর্ষীয়সী মহিলা দাঁড়াইয়াছিলেন। একজনের আকৃতিগত সাদৃশ্যে মনোহরবাবু তাঁহাকে তাঁহার মৃত বন্ধুর ভগ্নী বলিয়া সহজেই চিনিয়া লইতে পারিলেন। আগন্তুকের পরিচয় পাইয়া মহিলাদ্বয় তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মৃতদেহ উপরের একটি ঘরে রক্ষিত হইয়াছে জানাইয়া তাঁহাকে একবার শেষ দেখার জন্য উপরে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

উপরে যাইতেই সিঁড়ির নিকট দ্বিতীয় মুন্সেফ রমণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি পাশ কাটাইয়া নীচে পলাইবার চেষ্টায় আছেন। ইঙ্গিত ইসারায় উভয়ের মনোভাবের কতক আদানপ্রদান হইয়া গেল।

রমণবাবুর কিছু রোগারকমের চেহারা, মুখে গালপাট্টা গোছ চাপদাড়ী। হঠাৎ দেখিলে বড় গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়। লোকটি কিন্তু বড়ই আমোদপ্রিয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তাস না খেলিলে তাঁহার অন্ন পরিপাক হয় না। সহরতলীবাসী মনোহর বাবুকেও তিনি তাসের নেশায় মশ্‌গুল করিয়া তুলিয়াছেন। মিঃ মিত্রের ভগিনী ও তাঁহার সঙ্গিনীর সহিত সবজজবাবু সসঙ্কোচে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমণবাবু তখনও দাঁড়াইয়া; মনোহর বাবু বুঝিতে পারিলেন, আজ কাহার বাসায় তাসের আড্ডা বসিবে তাহাই স্থির করিবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন।

মেয়েরা মিসেস্ মিত্রকে সবজজবাবুর আগমন সংবাদ জানাইবার জন্য চলিয়া গেলেন। মনোহরবাবু রমণবাবুর ইঙ্গিত অনুসারে পার্শ্বের একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৃহকুট্টিমে মিত্র সাহেবের মৃতদেহ শবাধারে রক্ষিত হইয়াছে। ঘরে আরও কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন যুবক। একজন মৃতব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র, অপরটি কোনও প্রতিবেশী। ইঁহারা উভয়েই তাড়াতাড়ি খৃষ্টিয়ান প্রথায় ক্রশ চিহ্নের ন্যায় অঙ্গন্যাস করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। দুইজন বৃদ্ধা মৃতের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের নির্ব্বিকারচিত্ত মুখের ভাবেই প্রকাশ পাইতেছিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে পরস্পরের কানে কানে মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। একজন মোটা সোটা পাদরী সাহেব বড় গলায় প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। চাকর হারাধন কার্ব্বলিক পাউডারের ন্যায় কি একপ্রকার গন্ধাপহারী গুঁড়া মেজের উপরে ছড়াইতেছিল। মনোহরবাবু চাকরটিকে চিনিতে পারিলেন। গতবার যখন তিনি মিত্র মহাশয়কে রোগশয্যায় দেখিতে আসেন, তখন এই হারাধনই তাঁহার পরিচর্য্যায় রত ছিল। মিঃ মিত্র এই চাকরটির প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হইল। কিছুক্ষণ তথায় নতমস্তকে দাঁড়াইয়া

মনোহরবাবু তাঁহার বন্ধুর শবদেহের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। মৃত্যুকাঠিন্যে হাতপাগুলি আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে, শবাধারে ভালরূপ বিন্যস্ত হয় নাই। মাথাটি যেন নীচু হইয়া বালিশের ভিতর বসিয়া গিয়াছে। মৃত ব্যক্তির স্বাভাবিক গৌরবর্ণ পীত ও পাংশুর সংমিশ্রণ এক অপরূপ বর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে। দীর্ঘ নাসা ঝুঁকিয়া আসিয়া ওষ্ঠ স্পর্শ করিতেছে। রোগে দেহখানি পূর্ব্বাপেক্ষা শীর্ণ। মুখের ভাবে স্পষ্টই বোধ হইতেছিল, তাহাতে যেন আর কপটতার লেশমাত্র নাই। শেষ মুহূর্ত্তের সেই মুখভঙ্গী যেন স্পষ্টই জানাইতেছিল "আমার যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা ত ভালরূপেই করিয়াছিলাম, কোন বিষয়েই ত্রুটি করি নাই, তবুও দেখ, আমার এই দশা; এখন কেহই আমার আপনার নহে, সাধু সাবধান!"

বন্ধুগণের ব্যবহারে যে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার শৈথিল্য বা উদাসীনতা প্রকাশ পাইয়াছিল, একথা মনোহরবাবু স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হৃদয়হীনতার এ নীরব অভিযোগ তাঁহার নিকট মোটেই শোভন বলিয়া বোধ হইতেছিল না। রোগশয্যায় কতলোকে কতবার ইঁহার তত্ত্ব লইয়াছে, কতবার ইঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তবে আবার এ 'মরামুখে' অভিমানের পালা কেন? 'শেষের সেদিন' স্মরণ করিবার এই মৌন উপদেশ তাঁহার নিকট বড়ই তিক্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সবজজবাবু তাড়াতাড়ি সেস্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়া দেখিলেন, বাহিরেই বন্ধুবর রমণবাবু মুরুব্বির ন্যায় দাঁড়াইয়া পরম

গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতেছেন। এই সুরসিক সুবেশ বন্ধুটিকে দেখিয়া তাঁহার মনে অনেকটা শান্তি ফিরিয়া আসিল। রমণ বাবুকে দেখিবামাত্র বাস্তবিকই মনে হইতেছিল যে, এ বাটীর ঘটনার সহিত তাঁহার কোনও প্রকার সংস্রব নাই। মরিতে হয় রামপ্রসন্নই মরিয়াছে, সেজন্য তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন ধারা একচুল এদিক ওদিক হইবে কেন? "গতস্য শোচনা নাস্তি।" মরা মানুষের জন্য আবার দুঃখ কি। পূর্ব্বে তিনি যেরূপে সময় অতিবাহিত করিতেন, আজও ঠিক সেই ভাবেই করিবেন।

মনোহরবাবু বাহির হইয়া আসিতেই তিনি তাঁহার কানে কানে বলিলেন—"আজ তা'হলে তারকবাবুর ওখানেই বসা যাবে এখন।"

সবজজবাবুর কিন্তু তখন-তখনই খেলার এরূপ পরামর্শটা বড় ভাল লাগিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল, সে দিন যেন খেলাটা বন্ধ রাখিলেই ভাল হয়।

এই সময়েই মিসেস্ মিত্র আসিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রার্থনা প্রভৃতির অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন।

রমণবাবু সে আমন্ত্রণ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের কোনও ভাবই প্রকাশ করিলেন না। সপ্রতিভভাবে মিত্র-গৃহিণীকে নমস্কার করিয়া যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই খানেই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। মিসেস্ মিত্র সবজজবাবুকে দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতরভাবে কহিলেন—"আপনি যে আমার স্বামীর অকৃত্রিম

বন্ধু—তা' তাঁহার জীবিত অবস্থাতেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম।" সহানুভূতির আশায় তিনি পুনরায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। মনোহরবাবু চতুর লোক; বুঝিলেন, মৃতের কক্ষে প্রবেশ করিতে হইলে শোকচিহ্ন ধারণ করার যেরূপ প্রথা আছে, সেইরূপ মৌখিক সহানুভূতি জ্ঞাপনও আধুনিক শিষ্টাচারের অঙ্গবিশেষ—সুতরাং তিনিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি যে তাঁর সতীর্থ। শিশুকাল থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব ছিল, সে ত আর আজকালকার মত শুধু লোক দেখান শিষ্টাচার নয়।"

মনোহরবাবুর মনে হইল, এতক্ষণ পরে সময়োপযোগী একটা কিছু বলা হইয়াছে। ভাবাবেগে উভয়েই অল্পাধিক মাত্রায় বিচলিত হইলেন। মিসেস্ মিত্র বলিলেন—"উপরের এই হল ঘরে একবার আসুন, প্রার্থনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আপনার সহিত কয়েকটি বিষয়ে পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি।" তাঁহাদিগকে হলের দিকে যাইতে দেখিয়া রমণবাবু সবজজ মহাশয়ের প্রতি নিতান্ত অনুকম্পার সহিত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চোখের চাহনি যেন স্পষ্টই ব্যক্ত করিতেছিল, "আপন বুদ্ধির দোষে যদি কাহারও কর্ম্মভোগ ঘটে, তাহা হইলে অন্যে কি করিবে? আজ যদি তাস খেলায় হাত না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জানিবেন সে শুধু আপনার জন্যই হইল।"

হল ঘরটি নানারূপ সৌখীন সামগ্রী ও আসবাবে পরিপূর্ণ। ছোট ছোট সবুজ পাতা আঁকা লাল ক্রেটন কাপড়ে চেয়ার সোফা

প্রভৃতি আবৃত। মনোহরবাবুর মনে পড়িল—মিত্র মহাশয় স্বয়ং পছন্দ করিয়া এই কাপড় আনাইয়াছিলেন। মিত্র-গৃহিণী সবজজ-বাবুর জন্য একটি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া নিজে নিকটস্থ একটি সোফায় উপবেশন করিলেন। আসনের স্প্রিংগুলি পূর্ব্ব হইতেই কিছু খারাপ হইয়া গিয়াছিল, একটু নড়া চড়া করিতেই ক্যাচ্ কোচ্ শব্দ হইতে লাগিল। সবজজবাবু ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুপত্নীও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার প্রতি নিজ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিলেন। মিসেস্ মিত্রের মনে হইতে লাগিল যে তিনি মনোহরবাবুকে সেই ভাঙ্গা স্প্রিং-ওয়ালা কেদারাটি ছাড়িয়া দিয়া আর একটি আসনে উঠিয়া বসিতে বলেন, কিন্তু সে সময় কথা কহিলে পাছে জমাট বাঁধা সহানুভূতিটা নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে আর উচ্চ বাচ্য করিলেন না। কিন্তু অধিকক্ষণ নির্ব্বাক নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকাও ত বড় সহজ নহে; হঠাৎ মিত্র-গৃহিণীর মূল্যবান্ লেস্‌সংযুক্ত শাড়ীর পাড়টি একটি খোদাই কাজ করা টেবিলের প্রান্তে আটকাইয়া গেল। মনোহর বাবু আঁচলটি ছাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিতে না উঠিতেই ভার লাঘব পাইয়া গদীর স্প্রিংগুলি তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। সেই সময়ে মিসেস্ মিত্র লেস্‌টি প্রায় ছাড়াইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া সবজজবাবু পুনরায় সশব্দে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াও অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। মিসেস্ মিত্রও শত চেষ্টা করিয়া নিজ অঞ্চলটি সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত করিতে পারিলেন না, সুতরাং

সবজজকে পুনরায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া আবদ্ধ অংশটি সযত্নে ছাড়াইয়া দিতে হইল।

এই পর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিত্র-গৃহিণী চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। মনোহরবাবুর মুখে ক্রমশঃ বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বন্ধুপত্নীর শাড়ীর লেস্ রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার যেটুকু অতিরিক্ত উদ্যম আবশ্যক হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার সহানুভূতি অনেকাংশে উবিয়া গিয়াছিল।

সে সময় অপর এক ব্যক্তি কার্য্যব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হওয়ায় মিত্র-গৃহিণীকে বাধ্য হইয়া শোক সামলাইয়া লইতে হইল, সবজজ মহাশয়ও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। লোকটি ঐ বাটিরই একজন ভৃত্য। গোরস্থানে মনিবের সমাধির জন্য জমি ক্রয় করিতে গিয়াছিল। সে আর অধিক ভূমিকা না করিয়াই বলিল—"মেম সাহেব, আপনি যে অংশের কথা বলিতেছেন, তাহা তো দুই শত টাকার কমে হইবে না।" মিসেস্ মিত্র যূপকাষ্ঠনিবদ্ধ সদ্যোৎসৃষ্ট ছাগশিশুর ন্যায় নিতান্ত অসহায়ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মনোহরবাবুকে ইংরাজী ভাষায় বলিলেন—"আমি বড়ই মন্দ-ভাগিনী।" মনোহরবাবু এ কথার জবাব না দিয়া শুধু সম্মতিজ্ঞাপক মন্দ মন্দ শিরসঞ্চালন করিতে লাগিলেন; যেন বলিতেছেন, "তাহা ত বটেই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এরূপ অবস্থায় আর কি হওয়াই বা সম্ভব।" মিত্র-গৃহিণী টেবিলের উপরিস্থিত চুরুট কেসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"কই আপনি ত চুরুট

অল্পদিন পরেই রামপ্রসন্ন মহকুমা হইতে সদরে বদলী হইলেন। সদরে আসিয়া দিনগুলি আরও আরামে কাটিতে লাগিল; এখানে আট দশজন ডেপুটি মুন্সেফ—সুতরাং একটি বড় গোছের তাসের ও খোস গল্পের আড্ডা ছিল। রামপ্রসন্নের আগমনে—পুরাদমে ব্রিজ চলিতে লাগিল। এই স্থানে দুই বৎসর অবস্থানের পর রামপ্রসন্ন তাঁহার ভাবী স্ত্রী মিস্ হিমানীর সহিত পরিচিত হইলেন। সে সময় বঙ্গীয় খৃষ্টান সমাজে হিমানীর ন্যায় সুশিক্ষিতা কন্যা বড় মিলিত না। তাঁহার পিতাও রামপ্রসন্ন অপেক্ষা পদগৌরবে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। তিনি প্রথম গ্রেডের assistant surgeon—তখন কিছুদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে সিবিল সার্জ্জনের কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার চাকরী ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইতে কয়েক মাস বিলম্ব ছিল এবং এই কয়মাস কাটিয়া গেলে পেন্সন লইবেন এইরূপই স্থির ছিল। রায়বাহাদুর মতিলাল দত্তকে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ভালরূপই জানিতেন বিশেষতঃ প্যাদরী বংশোদ্ভূত তদানীন্তন বঙ্গের কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। যখন এই সাহেব মহোদয় জেলার সামান্য আসিস্‌টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্র ছিলেন সেই সময় কিছুদিন তাঁহাকে কোনও জঙ্গলময় প্রদেশে অবস্থিতি করিতে হয়। হঠাৎ তাঁহার পত্নী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। দূর হইতে সাহেব ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করিবার আর সময় ছিল না সুতরাং বাঙ্গালী ডাক্তার মতিলাল বাবুকেই চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে হইল।

সৌভাগ্যক্রমে মেমসাহেব অচিরে নিরাময় হইলেন এবং সেই অবধি দেশীয় ডাক্তার ও ইংরাজ সিবিলিয়ানে যে সৌহার্দ্দ বন্ধন সংস্থাপিত হইল তাহা উচ্চপদে সমারূঢ় হইয়াও সাহেব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। লাটদরবারে বড় সাহেব যাহার উপর প্রসন্ন, কালেক্টার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণও যে তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

রামপ্রসন্ন কোনও নিমন্ত্রণ-সভায় দত্তপরিবারের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। পরে গির্জ্জা-গৃহে ও সভা সমিতিতে তাঁহাদের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি দত্তগৃহে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। প্রায়ই তাঁহার সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম রামপ্রসন্নের সেরূপ বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। হিমানীর সহিত আলাপ ভাসা ভাসা ভাবেই হইত। কিন্তু কুমারীর হৃদয় লইয়া এরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া খেলা করিতে গেলে ক্রমেই অনুরাগের সৃষ্টি হয়। কলেজে পড়িবার সময় রামপ্রসন্ন সুকণ্ঠ গায়ক ও সক্ষম অভিনেতা বলিয়া বন্ধুসমাজে পরিচিত ছিলেন। ইনষ্টিটিউট গৃহের নাট্যশালায় অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য তিনি কয়েকটি সুবর্ণ পদক ও পুরস্কার পাইয়াছিলেন। চাকরীতে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি সঙ্গীতচর্চ্চার দিকে বড় ঝোঁক ছিল না। ভাবিতেন হাকিমি করিতে গেলে মজলিসি আমোদ ছাড়িয়া গম্ভীর হওয়াই আবশ্যক। এখন আবার নূতন উদ্যমে গীতবাদ্যের অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। এই সঙ্গীতচর্চ্চার অছিলায় কুমার-কুমারীতে একটু অধিক

ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। ফলে বালিকা তাহার মনের ভাব মুখে প্রকাশ না করিলেও আকার ইঙ্গিতে কোনও কথাই গোপন রহিল না। হিমানী কুরূপা নহে; তাহার পিতাও সঙ্গতিপন্ন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি কন্যার নামে দশ সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া রাখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রামপ্রসন্ন ভাবিলেন, বিবাহ করিতে ক্ষতি কি? আমার এ উন্নতির দশায় চেষ্টা করিলেই বহুতর সম্বন্ধ জুটিবে বটে, কিন্তু উপস্থিত পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নহে। বেতনের তুলনায় স্ত্রীর কোম্পানীর কাগজের সুদ সামান্য বটে, কিন্তু তাহাতে ত আর কিছু হাত দিতে হইবে না, পুরাপুরিই ব্যাঙ্কের খাতায় জমা থাকিবে সুতরাং দোষটা কি? ভাবী স্ত্রী মিষ্ট-ভাষিণী—হাল ফ্যাসানে দীক্ষিতা ভামিনী—ডানাকাটা পরী না হইলেও মোটের উপর সুশ্রীই বলিতে হয়; তাহার উপর নবোদ্ভিন্ন যৌবনের নবীন ছটা—সুতরাং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া রামপ্রসন্ন স্বেচ্ছায় দিল্লীর লাড্ডু আস্বাদন করিলেন। রামপ্রসন্ন হিমানীর সহিত প্রেমে পড়েন নাই। সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়কব্যাপারে উভয়ের মতের কোনও ঐক্য আছে কি না তাহার কোনও খোঁজ লয়েন নাই। তাঁহার আত্মীয়স্বজন কেহই এ বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই বরং তাঁহার কোন কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর মতে এত তাড়াতাড়ি করিয়া এরূপ একটা আজীবনস্থায়ী সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। আমরা তাঁহার রোজ নামচায় দেখিয়াছি, তিনি সকাল সকাল বিবাহ করার তিনটি প্রধান কারণের উল্লেখ

করিয়াছেন—প্রথমতঃ ঐ সম্বন্ধটি আপনা হইতেই জুটিয়া গেল, দ্বিতীয়তঃ কন্যাটি দেখিতে মন্দ নহে, এবং তৃতীয়তঃ তিনি খাস উপরওয়ালার প্রীতিপাত্র কন্যাপক্ষের কোন আত্মীয়ের নিকট আভাস পাইয়াছিলেন যে এ বিবাহে রাজী হইলে কর্ত্তৃপক্ষও প্রসন্ন হইবেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় রামপ্রসন্নের শ্বশুরমহাশয়ের রায় বাহাদুরী বুদ্ধির দৌড় নেহাইৎ কম ছিল না। সেই হেতু রামপ্রসন্ন অচিরাৎ বিবাহ করিলেন।

আদর সোহাগ নব অনুরাগে নব দম্পতীর মধুচন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে কাটিয়া গেল। নূতন সংসারে নূতন গৃহস্থালী। তৈজস পত্র বসন ভূষণ শয্যা পালঙ্কাদি সমস্তই নূতন। এ যেন ধরার উপর পরীরাজ্য। ক্রমে মোহ কাটিতে লাগিল। বৎসরেক পরেই হিমানী সন্তানসম্ভবা। রামপ্রসন্ন ভাবিয়াছিলেন জীবনের যেরূপ একটানা স্রোত বহিতেছিল চিরকালই সেইরূপ বহিতে থাকিবে। বাধা পড়িয়া এ নদীর মোহানা বন্ধ হইবার নহে। কিন্তু অকস্মাৎ এ কি পরিবর্ত্তন। দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনের যে এরূপ সংযোগ আছে রামপ্রসন্ন তাহা জানিতেন না। এখন আর দৃষ্টি মাত্রেই পুলক ছুটে না, অনুরাগ হঠাৎ বিরাগে পরিণত হইয়া যায়, অমৃত তুলিতে হলাহল উঠিবার উপক্রম হয়। রামপ্রসন্ন প্রণিধান করিয়া দেখিলেন যতই বিরক্তিকর হউক এ অচিন্ত্যপূর্ব্ব অভিনব পরিণতির হাত এড়াইয়া আর পালাইবার উপায় নাই!

রামপ্রসন্নের মনে হইত তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী জীবনের সুখ-সৌন্দর্য্য স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিতেছেন। এখন কথায় কথায় মান

অভিমান। পান হইতে চূণ খসিলেই অনুযোগ ক্রন্দনের পালা। এরূপ আর কয় দিন সহ্য করা যায়। সর্ব্বক্ষণ নিকটে থাক, না থাকিলেই নানারূপ অপ্রীতিকর সন্দেহ। ইহাকেই বলে জীবন মরুভূমি হওয়া।

রামপ্রসন্ন ভাবিয়াছিলেন দার্শনিকের ন্যায় স্থিরচিত্তে ক্রমাগত এ সব উপেক্ষা করিতে থাকিলেই সকল গোলমাল কাটিয়া যাইবে। প্রথম প্রথম তিনি পত্নীর বিরক্তির ভাব বড় দেখিয়াও দেখিতেন না, ধীরভাবে নিজ কার্য্য করিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে বন্ধুবর্গকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং সন্ধ্যার সময় নিয়মমত তাসের আড্ডায় হাজিরা দিতেন। কিন্তু এরূপ নির্লিপ্ত ভাবে বেশী দিন চলিল না। গৃহিণী ক্রমেই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরিতে আরম্ভ করিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের জিদ বজায় না থাকিত, ততক্ষণ কলহ ক্রন্দনে বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিতেন। সন্ধ্যার পর আর চৌকাট পার হইবার যোটি ছিল না। সারাদিন পরিশ্রমের পর অপ্রসন্ন মনে বাড়ী বসিয়া থাকা রামপ্রসন্নের নিকট বড়ই অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভাব গতিক দেখিয়া ক্রমশঃ ভীত হইয়া পড়িলেন।

এতদিনে রামপ্রসন্ন নিজে ঠেকিয়া বুঝিতে পারিলেন যে সংসার-ক্ষেত্র বড় আনন্দের নিলয় নহে। জীবনে সুখের চেয়ে অশান্তিই বেশী; অন্ততঃ তাঁহার নিজের ভাগ্যে সুখের বখরাটা যে বড় বেশী পড়ে নাই সে বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ মাত্র রহিল না। এখন কি প্রকারে পত্নীর খামখেয়ালীর দায় এড়াইয়া স্বেচ্ছায় আত্ম-জীবন

নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় এই চিন্তাই তাঁহার আহারনিদ্রা হরণ করিবার উপক্রম করিল। সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। রামপ্রসন্নও অবশেষে পরিত্রাণের এক পন্থা আবিষ্কার করিলেন। হিমানী সংসারে একটি জিনিষকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলিত উহা আফিসের সরকারী কার্য্য। সরকারী কার্য্যের ব্যত্যয় হইলে যে স্বামীর চাকরী লইয়া টান পাড়াপাড়ি হইবে এবং সরকারী কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে যে পদোন্নতি তথা বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা একথা সে ভালরূপেই অবগত ছিল। সুতরাং সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার জন্য রামপ্রসন্ন মিত্র মহাশয় যখন দ্বিগুণ উৎসাহে সরকারী কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, এবং রাশি রাশি নজীর ও আফিস্ ম্যানুয়েল এবং বস্তা বস্তা ফাইল ও নথি আনিয়া যখন নিজের চতুষ্পার্শ সুরক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে প্রাচীর ভেদ করিয়া কোন্দল করা হিমানীর পক্ষে বড় সহজসাধ্য হইল না। পত্নীর মেজাজ যতই উগ্রতর এবং সাংসারিক গোলযোগ যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, রামপ্রসন্নও সেই অনুপাতে সরকারী কার্য্যের অগাধ সমুদ্রে ডুব দিয়া ক্রমশঃ তলাইতে আরম্ভ করিলেন। এতদিন মিত্রজার সরকারী দপ্তরে খ্যাতি লাভের তেমন উৎকট আকাঙ্ক্ষা ছিল না, এখন তিনি বার্ষিক রিপোর্টে নিজ নাম দেখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

যথা সময়ে রামপ্রসন্নের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু ইহাতে শান্তি হওয়া দূরে থাকুক, হাঙ্গাম যেন আরও বাড়িয়া চলিতে থাকিল। সৌখীন গৃহস্থের জন্য ঈশ্বরেচ্ছায় বৈলাতিক

শিশুপুষ্টিকর খাদ্যের বড় অভাব নাই। ইহার কোন্‌টি ব্যবহার করিলে নবজাত শিশু শশিকলার মত বৃদ্ধি পাইবে তাহা লইয়াই প্রথমতঃ বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। শিশুদেহে খাদ্যাখাদ্যের অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অনেক স্থলেই হিতে বিপরীত হইয়া থাকে, এস্থলেও প্রায় ঘটিল তাহাই। শিশু ও তাহার গর্ভধারিণী উভয়েই নানারূপ প্রাকৃত এবং কাল্পনিক পীড়ায় কষ্ট পাইতে লাগিল। রামপ্রসন্নের স্ত্রীরোগ ও বালরোগাধিকারে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা ছিল না, আর থাকিলেই বা কি হইবে? কথায় কথায় নিজগৃহ হইতে চিকিৎসালয় পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়ি না করিতে পারিলে কি পরিত্রাণ আছে? গৃহিনী তখনই দয়া লেশ হীন বর্ব্বরের হাতে পড়িয়াছেন বলিয়া খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত করিবেন্ন সুতরাং রামপ্রসন্ন পীড়া ও শুশ্রূষার বিষয় অধিক কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন অন্ততঃ মমত্বের বাহ্যিক অনুষ্ঠানে বিশেষ রকম ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সংসারের ঝালাপালা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মিত্রজাও ততই দূরে দূরে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মযোগীর ন্যায় নির্লিপ্তভাব। পরিবারবর্গের সহিত যথোচিত ব্যবধান রাখিয়া এরূপভাবে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন—যাহাতে অপর কাহারও ক্ষণিক সুখদুঃখ বা রাগদ্বেষ গৃহস্বামীর মনে কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়। স্ত্রী-গ্রহণের ঠিক দুই বৎসর মধ্যেই রামপ্রসন্ন বুঝিতে পারিলেন যে বিবাহটা বড়ই জটিল ও দুর্ব্বোধ ব্যাপার। যেমন নূতন কলেজ ছাড়িয়া চাকরী বা ওকালতি

করিতে গেলে মনকে ক্রমশঃ সে দিকে লওয়াইতে হয় দাম্পত্য-জীবনেও তেমনি অনেক অপ্রীতিকর অনুভূতি ক্রমশঃ সহ্য করিয়া লইতে হয়। প্রথম প্রথম খাওয়ার সময় আফিমের তিক্ত আস্বাদনে কষ্ট বোধ হয় বটে, কিন্তু ক্রমশঃ সে তিক্ততা আর গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না।

জীবনে অনেককেই এইরূপ দার্শনিক গবেষণার দ্বারা সত্য আবিষ্কার করিতে হয়। রামপ্রসন্নও এইরূপে সত্য নির্ণয় করিয়া পারিবারিক বিষয়ে নিজের পূর্ব্বভাব অনেকটা বদ্‌লাইয়া লইলেন। নিজ গৃহে যেটুকু আরাম বিনা আয়াসে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার অধিক আর তিনি কিছুই প্রত্যাশা করিতেন না। কিন্তু তা হইলে কি হয়? বাহিরে মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য যেটুকু ব্যবস্থা আবশ্যক, হাজার গোলমাল সত্ত্বেও তাহা না করিয়া ত পার পাইবার উপায় নাই। সুতরাং ঝি, চাকর, পাচক প্রভৃতির বেতনের বন্দোবস্ত, ছেলেদের সহিত একত্রে আহার, স্বগৃহে রাত্রি বাস এবং পদমর্য্যাদার উপযোগী বাহ্যিক চালচলন সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় বাহাল রহিল, কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্যে এইটুকু দেখা গেল যে তিনি এখন হইতে আর আরামের আশায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন না, বরং অবসরকালে বন্ধুমহলেই হাসিমুখের সন্ধানে ফিরিতেন। যদি কাহাকেও গম্ভীর বা বদ্‌মেজাজী বলিয়া বোধ হইত মিত্রজা আর তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিতেন না। কোথায় বিদ্বেষ বা রূঢ় ব্যবহারের আভাস পাইলে নিজের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মবহুল জীবনের ভিতর নিজকে গুটাইয়া লইতেন এবং ষোল আনার

স্থলে আঠার আনা রকম রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহাতেই আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিতেন। বিচার কার্য্যে তাঁহার সুখ্যাতি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অল্প কালের মধ্যে তিনি উচ্চ শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ফলে যতই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, রামপ্রসন্নও ততই ক্রমশঃ জটিলতর মোকর্দ্দমায় খাসা ইংরাজীতে সুন্দর সুন্দর রায় লিখিয়া নিজ পারদর্শিতায় নিজেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। উচ্চ শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোক্তার মহলে ও পুলিস কর্ম্মচারিগণের মধ্যে তাঁহার অনেকটা কদর বাড়িয়া গিয়াছিল। একটি সুবৃহৎ মহকুমার দ্বিতীয় কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার খাতিরের অভাব ছিল না। রামপ্রসন্ন সাজা দেওয়াই চাকরীর মূল মন্ত্র করিয়া তোলেন নাই। তিনি বুঝিতেন, সাজা দেওয়া বা খালাস দেওয়ায় কিছু আসে যায় না কিন্তু এরূপ ভাবে বিবেচনা করিয়া রায় লিখিতে হইবে যাহাতে অপর কেহ অন্য মত না হইতে পারে। এই বুদ্ধিতে কাজ করিয়া রামপ্রসন্নকে উপর আদালতের নিকট বড় গালি খাইতে হইত না, এমন কি তাঁহার রায় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপিলে গিয়াও সহজে উল্টাইত না। মিত্রজা ভাবিতেন কর্ম্মসার চাকুরী জীবনে ইহা অপেক্ষা আর কি সুখের কারণ হইতে পারে।

ক্রমে রামপ্রসন্নের আরও দুই তিনটি সন্তান হইল এবং তাঁহার স্ত্রীর ব্যবহার ক্রমশঃ আরও কর্কশ ও অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু রামপ্রসন্ন যে বুদ্ধিতে নিজের পারিবারিক জীবন

নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন তাহার গুণে আর তাঁহাকে এসব ঝড় ঝাপ্‌টা সহ্য করিতে হইত না। সরকারী কর্ম্মের মোহিনী মায়ায় তিনি গৃহিণীর মানসিক প্রভাব একরূপ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, এখন আর বিগত-যৌবনা পত্নীর মেজার্জের ঝাঁঝে তাঁহার আর বড় আসিয়া যাইত না। এইরূপে সাত বৎসর কাটিল। আর এক গ্রেড প্রমোশন পাইয়া রামপ্রসন্ন অন্যত্র বদ্‌লী হইলেন। এ বদ্‌লী শুধু এক জেলা হইতে আর এক জেলায় নহে, একবারে নূতন প্রদেশ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে। নূতন চাকরী স্থানে ভালরূপ বাসা মিলিল না। মোটা রকম ভাড়া হাঁকিয়াও দেড়খানি কোটা সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িল। বদ্‌লী সম্বন্ধে ডেপুটি সবডেপুটি-দিগের প্রায় প্রবাদ কথিত পল্লীবালিকার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়াই বিবাহের ব্যবস্থা। জরুরী কার্য্য পড়িলে যে কোনও মুহূর্ত্তে তল্‌পী তাল্‌পা লইয়া অন্য স্থানে রওনা হইবার হুকুম আসিতে পারে সুতরাং কোথাও গিয়া নিজ খরচায় বাসস্থানের পাকা বন্দোবস্ত করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। এ নূতন জায়গা রামপ্রসন্নের পত্নীর বড় ভাল লাগিল না। বাসার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মেজাজ আরও বিগড়াইয়া গেল। বাসারও যেরূপ অসুবিধা, জিনিষপত্রও সেইরূপ মহার্ঘ। মাহিনাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খরচও বাড়িয়া উঠিল। ম্যালেরিয়ার প্রভাবে পর পর দুইটী শিশুর মৃত্যু হইল। ঘর সংসার একরূপ অসহ্য হইয়া উঠিল।

নূতন স্থানে আসিয়া অবধি এই সকল জ্বালা যন্ত্রণা শোক ভোগের যা কিছু অপরাধ রামপ্রসন্নের সাধ্বী গৃহিণী তাহা নিরপেক্ষ

ভাবে স্বামীর স্কন্ধে চাপাইতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। এখন স্বামী স্ত্রীতে সাংসারিক বিষয়ে কথা আরম্ভ হইলেই রীতিমত কলহ না হইয়া শেষ হয় না। এমন কি মধ্যে মধ্যে ছেলেদের লেখা পড়ার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়াও এইরূপ ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইয়া থাকে। মহাভারতীয় যুগে যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বসায়াহ্নে পিতামহের শিবিরে আসিয়া স্নেহ সম্ভাষণের ন্যায় দাম্পত্য-কলহের ব্যবধানে ক্বচিৎ কদাচিৎ পুনর্ভব প্রীতির বিকাশ দেখা যাইত বটে, কিন্তু মরু-মুখে তুষারপাতের ন্যায় এই সকল সুদুর্ল্লভ সন্ধিক্ষণ কদাপি দীর্ঘস্থায়ী হইত না। দুইদিন যাইতে না যাইতে প্রচ্ছন্ন বিরোধ পূর্ব্বের ন্যায় নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইত।

ক্রমে উভয়ের আন্তরিক বিচ্ছেদ বেশ স্থায়ীভাবেই দাঁড়াইয়া গেল। রামপ্রসন্ন মনে করিতেন যে পারিবারিক জীবনের সর্ব্বত্র এই একই পরিণতি। যথাসম্ভব বিরক্তি বর্জ্জন করিয়া কোন প্রকারে ঝগড়াগুলিকে খাটো করিয়া তুলিতে পারিলেই গৃহীর কর্ত্তব্য সুসম্পাদিত হইল। এই বিশ্বাস না থাকিলে রামপ্রসন্নের জীবন একেবারেই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত। হতাশার নিছক তিক্তাস্বাদ তিনি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। আফিসটাকে বড় করিয়া তুলিতে পারিলেই ঘরগৃহস্থালী আর বড় নজরে পড়ে না। মিত্রজা এই মূল সত্যের সন্ধান পাইয়া পারিবারিক প্রসঙ্গ যথাসম্ভব কমাইয়া আনাইতেছিলেন। স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তার অনাবশ্যক অবসর তিনি আর বড় রাখিতে চাহিতেন না। নেহাৎ যেদিন

সকাল সকাল আফিসফেরৎ আসিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আটকা পড়িয়া যাইতেন সেদিন সুভাষিণী ধর্ম্মপত্নীর তীব্রকণ্ঠের বিষাণ বাজিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বৈঠকখানায় বন্ধু-সমাগমের ব্যবস্থা করিতে হইত। স্ত্রীর সহিত বনিবনা হইত না বটে—কিন্তু বাহিরের লোক ইতর ভদ্র, উচ্চ নীচ সকলের সহিতই বেশ তাঁহার সদ্ভাব ছিল। সরকারী কাজ ও আত্মসম্মান রীতিমত বজায় রাখিয়া তাঁবেদার উপরওয়ালা ও অপর সাধারণকে খুসি রাখিতে পারাও বড় কম বাহাদুরী নহে।

ফৌজদারী ও রাজস্বসংক্রান্ত বড় বড় বিরোধ উপস্থিত হইবামাত্র জলের মত মীমাংসা করিতে সমর্থ হওয়া সকল রাজকর্ম্মচারীর ক্ষমতায় কুলাইয়া উঠে না। রামপ্রসন্ন সাংসারিক ব্যাপারে অসুখী বলিয়াই মনে মনে নিজের ব্যবহারিক দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতার বিষয় স্মরণ করিয়া অনুকল্পে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভের চেষ্টা পাইতেন। এইরূপে মনটাকে চাঙ্গা করিয়া লইয়া মিত্রজা গৃহকলহের পর পুনরায় বন্ধুগণের সহিত হাসিমুখে মেলামেশা করিতেন। তাঁহার বাহিরের ভাব দেখিয়া সত্য সত্যই মনের ভিতর যে একটা বড় ঝড় বহিয়া গিয়াছে এ কথা কেহ টের পাইত না। নীলকণ্ঠের ন্যায় যে বিষ তিনি স্বেচ্ছায় পান করিয়াছিলেন তাহার তিনটী প্রতিষেধক ছিল—বন্ধু-সমাগম, আহারাদির পারিপাট্য ও ব্রিজের সর্ব্বসন্তাপহারী মহিমা।

এইরূপে আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। মেয়েটি এখন বড় হইয়াছে। দুইটী সন্তান মারা যাওয়ার পর আছে কেবল

একটি পুত্র। সে এখন স্কুলে পড়িতেছে। মেয়েটী বাড়ীতে মাষ্টারের কাছেই পড়ে।

ইচ্ছা থাকিলে বাতাসে ফাঁদ পাতিয়াও ঝগড়া করা চলে। ছেলে বড় হইয়া কি হইবে তাহা লইয়াও হিমানী এখন হইতেই মধ্যে মধ্যে স্বামীর সহিত কলহ আরম্ভ করিয়া দিত। রামপ্রসন্নের ইচ্ছা ছিল ছেলেকে আইন পড়াইবেন কিন্তু স্বামীর মত বলিয়াই গৃহিণীর ইহাতে ঘোর আপত্তি। ছেলে বাপ্‌কো বেটা শনৈঃ শনৈঃ পাঠে অগ্রসর হইতেছিল।

৩

রামপ্রসন্নের বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সব ডেপুটিদিগের মধ্যে তিনি এখন একজন সিনিয়ার কর্ম্মচারী। ইতিমধ্যে দুই একটি ভাল জায়গায় বদ্‌লীর কথা হইয়াছিল কিন্তু নূতন স্থানে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত ভালরূপ বনিবনাও হইবে কি না ভাবিয়া কোনওরূপে পাশ কাটাইয়াছেন। অস্বাস্থ্যকর জল হাওয়া বা বাসার অসুবিধা বলিয়া কেহই সে স্থানে আসিতে চাহিত না সুতরাং রামপ্রসন্ন এ যাবৎ নির্ব্বিঘ্নে গট্ হইয়া বসিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন তাঁহার স্বেচ্ছায় এই দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের ফলে রাজ্যলাভ না ঘটুক অন্ততঃ ডেপুটিগিরি লাভ হইবে কিন্তু প্রমোশনের সময় দেখা গেল নীচের গ্রেড হইতে কে এক মোহনলাল ত্রিপাঠী প্রবেশনারী ডেপুটি নিযুক্ত হইয়াছেন। রাগেতে রামপ্রসন্নের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

সে যে সম্ভবতঃ যোগ্যতর ব্যক্তি তাঁহার স্বার্থ সঙ্কুচিত চিত্তে সে কথা মোটেই স্থান পাইল না। ত্রিপাঠীর উদ্দেশ্যে যথেষ্ট গালিমন্দ করিয়া তিনি কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ কলহের ফলে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিল। ডেপুটিগিরি ত হইলই না, পরের বার গ্রেড প্রমোশনের সময় দেখা গেল রামপ্রসন্নের নাম বাদ পড়িয়াছে। রামপ্রসন্নের বন্ধু একজন নবীন মুন্সেফ বলিলেন—"ওহে তোমরা ত কোষ্ঠী টোষ্ঠী মান না, কোষ্ঠী থাকিলে দেখিতে তোমার এ বৎসরকার ফল মোটেই ভাল নয়।" বাস্তবিকই রামপ্রসন্নের জীবনে এরূপ দুর্ব্বৎসর আর পূর্ব্বে কখনও আসে নাই। রামপ্রসন্ন দেখিলেন মহকুমার হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া সিবিলয়ান উপরওয়ালারা পর্য্যন্ত সকলেই যেন তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তাহার পর তাঁহার উপর এরূপ যে একটা অবিচার হইয়া গেল তাহাতে সহানুভূতি দেখান দূরে থাকুক সকলেই সেটা যেন নিতান্ত ন্যায্য বলিয়া মনে করিতেছেন। প্রমোশন তো বন্ধ হইল কিন্তু এদিকে খরচের মাত্রা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে আর এ বেতনে কোন মতেই চলে না। পূর্ব্বে বাড়ী হইতে ছেলেপিলের জামা কাপড় ও বড়দিনের খরচ খরচার জন্য মধ্যে মধ্যে টাকা আসিত এখন তাহাও বন্ধ হইয়াছে। রামপ্রসন্নের মনে হইতে লাগিল তাহার দুরদৃষ্ট দেখিয়া আত্মীয় স্বজনেরাও যেন তাহাকে ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। "চালাইতে জানিলে ১৭০৲ টাকাতেই দুধে ভাতে চলে, আজকালকার চাকরীর বাজারে এই বা কয়জনের

অদৃষ্টে জোটে” অভাবের সময় আত্মীয় বন্ধুর মুখে এরূপ সদুপদেশ শুনিলে কাহার না পরশুরামের মত ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে? শুধু রামপ্রসন্নই জানিতেন যে স্ত্রীর সহিত এই বিবাদ বিসম্বাদ তাঁহার অবস্থাতিরিক্ত সাহেবিয়ানার ফলে গুরু ঋণভার, এবং অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষের এই অন্যায় অবিচার, তাঁহার মানসিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। রামপ্রসন্ন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া গ্রীষ্মের সময় দুই মাসের privilege leaveএর (হক ছুটীর) দরখাস্ত করিলেন। ভাবিলেন পূরা বেতন যখন পাওয়া যাইবে তখন আর আপত্তিটা কি? ছুটী মিলিল। যশিদি জংসনের নিকট তাঁহার শ্যালকের একখানি বাংলো খালি ছিল, সেইখানেই মিত্রজা সপরিবারে উপস্থিত হইলেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে খোলা মাঠের নির্ম্মল হাওয়ায় ছুটীটা বেশ আনন্দে কাটিবারই কথা; কিন্তু ফলে তাহার উল্‌টা হইয়া পড়িল। এরূপ নিষ্কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকিয়া আলস্যে কাল কাটান তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল এরূপ একটানা ক্লান্তি পূর্ব্বে তিনি কখনও অনুভব করেন নাই। রামপ্রসন্ন ভাবিয়া দেখিলেন, এই রকম করিয়া ছুটীটা কাটাইলে কোন লাভই হইবে না। একবার উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আর এক নূতন উপসর্গ দেখা দিল। কয়েক দিন ধরিয়া রাত্রে আর ভাল করিয়া ঘুম হইতেছিল না। একরাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় ছাদের উপর কাটাইয়া রামপ্রসন্ন মনে মনে স্থির করিলেন যে ডেপুটিগিরির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বরং অন্য কোনও বিভাগে চাকরীর চেষ্টা

দেখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া স্ত্রী ও শ্যালকের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সটান কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন। কোন পদস্থ সহযাত্রীর নিকট জানিতে পারিলেন যে পুরাতন আমলের সেই সেটেলমেণ্ট বিভাগের বড়কর্ত্তা এখন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, শুনিয়া মনে কতক আশার সঞ্চার হইল।

রামপ্রসন্ন সেক্রেটারী সাহেবের নিকট হাজির হইলেন, এবং তাঁহাকে তাহার সবিনয় ব্যবহারে ও পূর্ব্বস্মৃতির আলোচনায় সন্তুষ্ট করিয়া মুন্সেফী বিভাগে Service transfer বা চাকরী-বদ্‌লীর জন্য একখানি দরখাস্ত পেশ্ করিলেন। রামপ্রসন্নের আবেদনে দুইটী বড় জোর দাবীর কথা ছিল। প্রথম কলেজ হইতে M. A. B. L., পাশ হওয়ার পরই তিনি মুন্সেফীর জন্য নাম লেখান। আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেও এবং ঠাকুর-পদক প্রভৃতি পুরস্কার পাইলেও হাইকোর্ট হইতে তাঁহার সম্বন্ধে সেরূপ সুবিবেচনা করা হয় নাই বরং নেহাৎ সাধারণ শ্রেণীর অনেক কর্ম্ম-প্রার্থী তাঁহার পূর্ব্বেই মুন্সেফীতে বাহাল হইয়া গিয়াছেন। ডেপুটিত্বের মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া মুন্সেফীর দিকে আর খেয়াল না রাখিয়া তিনি নিজেই যে সেটেলমেণ্ট বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ বুদ্ধিমান্ রামপ্রসন্ন সে কথা আর উল্লেখ করার প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন না। তাঁহার ২য় দাবী এই যে হিন্দু মুসলমান এই উভয় জাতির লোকই মুন্সেফী কর্ম্মে বাহাল আছেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান মুন্সেফের একান্ত অভাব; সুতরাং আবশ্যক গুণাবলী থাকা

সত্ত্বেও যদি খৃষ্টীয় সমাজের একজন সুযোগ্য প্রতিনিধির অদৃষ্টে এ চাকরী না ঘটে তাহা হইলে উহা বড়ই পরিতাপের বিষয়—সন্দেহ নাই। এরূপ ন্যায্য নিবেদনের আর কে প্রতিবাদ করিবে। সেক্রেটারিয়েট হইতে আশানুরূপ মন্তব্যের সহিত দরখাস্ত খানি হাইকোর্টে প্রেরিত হইল। জজ বাহাদুরও কৃপাদৃষ্টি করিলেন, রামপ্রসন্ন ২৫০৲ টাকা বেতনে মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন, এবং স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করিয়া এ সংবাদ জানাইলেন। এতদিনে তাঁহার রায় বাহাদুর শ্বশুরের কন্যা জামাইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা কতকাংশে ফলবতী হইল।

রামপ্রসন্ন কর্ত্তৃপক্ষের উপর অভিমান ভুলিয়া গেলেন। আর চাকুরীর উপর কোনও বিরক্তি রহিল না। যাহারা তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া উপরে উঠিয়াছিল তাহাদের উপরও এখন আর কোনও রাগ ছিল না। Service transfer মঞ্জুর হইয়া মুন্সেফী পদে বাহালী পরওয়ানা গেজেট ভুক্ত হওয়ার অনতিপূর্ব্বেই পূর্ব্বতন চাকরীতেও তাঁহার উচ্চতর গ্রেডে প্রমোশন হইল। তিনি পিছনকার বেতন বাবদ নগদ ৪০০৲ টাকা হাতে পাইলেন। রামপ্রসন্নের আনন্দের আর অবধি রহিল না। যে ঋণের ভয়ে তিনি শশব্যস্ত হইয়াছিলেন তাহা ফুৎকারে উড়িয়া গেল। রাম-প্রসন্ন পরমানন্দে যশিদি ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী ও শ্যালকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার চিত্তে কখনও এরূপ প্রফুল্লতা—এরূপ নির্ম্মল সন্তোষের বিকাশ হয় নাই। হিমানীও স্বামীর উন্নতিতে আনন্দিত হইয়াছিলেন। এইবার

স্বামী-স্ত্রীতে বোঝা পড়া হইয়া সন্ধি হইয়া গেল। রামপ্রসন্ন সাহেবগণের নিকটে কিরূপ আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, তাহা সালঙ্কারে বর্ণনা করিলেন। ছুটীর মধ্যে কলিকাতায় অবস্থান কালে কোনও ধনীর প্রাসাদে ডেপুটি সবডেপুটিগণের সাংবাৎসরিক ভোজে রামপ্রসন্ন নিমন্ত্রিত হ'ন। এ যাবৎ চাঁদাই দিয়া আসিতেছিলেন, চাকরী স্থান ছাড়িয়া উপস্থিত হইবার অবসর পান নাই। এখানে নবীন সহকর্ম্মিগণ কিরূপ চাটুবাক্যে তাঁহাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বিগণ কিরূপ সলজ্জভাবে তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়াছে এবং ভোজের পাণ্ডাগণ তাঁহাকে কিরূপ আদর আপ্যায়ন করিয়াছে এসব কোন কথাই আর অপ্রকাশ রহিল না। হিমানী এই সুদীর্ঘ কাহিনী স্থির ভাবেই শুনিল—অন্ততঃ বাহিরে ভাব দেখাইল যেন সব কথাই ধ্রুব সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্বে যে কথায় কথায় প্রতিবাদ করিত সে অভ্যাসটিও যেন সে বহুদিন হইতেই বিস্মৃত হইয়াছে।

স্ত্রীর মতি গতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া রামপ্রসন্ন মনে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন; বরং অপ্রত্যাশিত বলিয়া এ আনন্দ আরও বিশেষ ভাবে উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে উভয়ে যেন পর্ব্বতগাত্র হইতে সর্ সর্ শব্দে বেগে খাতের দিকে পিছলাইয়া পড়িতেছিলেন, হঠাৎ দৈবক্রমে বাধা প্রাপ্ত হইয়া যেন পুনরায় সমতল উপত্যকায় উপনীত হইলেন। এখন নূতন দেশে নূতন ঘর কিরূপে সাজাইতে গুছাইতে হইবে পতি-

পল্লীতে তাহারই যত জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। রামপ্রসন্ন দেখিলেন স্ত্রীর সহিত আর বড় মতভেদ হইতেছে না। গৃহ-সজ্জাদির সম্বন্ধে উভয়ের মত আশ্চর্য্য ভাবে মিলিয়া যাইতেছিল। আশাকুহকিনী পুনরায় চিত্তকুহরে মৃদু গুঞ্জন করিতে করিতে মায়ার ফাঁদ পাতিতে বসিল—এ যেন সেই প্রথম দাম্পত্য-সুখের নূতন করিয়া আস্বাদ গ্রহণ! মান ও মাথুরের পর মিলনের গাঢ়তা প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। রামপ্রসন্ন ভাবিলেন, জীবনস্রোত পূর্ব্বেরই ন্যায় ধীর, স্থির, মধুময় হইয়া উঠিতেছে। কয়েক দিনের জন্য শ্যালক-গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে নূতন চাকরীর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। সময় আর বড় বেশী ছিল না; ইতিমধ্যে বাসা ঠিক করিতে হইবে। পুরাতন আসবাব-পত্র লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পর সাজ-সরঞ্জাম তৈজসাদি কিনিয়া গৃহটীকে নিজের ও অর্দ্ধাঙ্গিনীর পছন্দমত ভাল করিয়া সাজাইতে হইবে—রামপ্রসন্ন সপরিবারেই যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার শ্যালকের হঠাৎ একটু অত্যধিক সহোদরা-স্নেহের আবির্ভাব হইল। তিনি বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন যে হিমানীকে এখন কোন মতেই পাঠাইতে পারিবেন না। তাহাকে আরও কিছু-দিনের জন্য সেখানে রাখিয়া রামপ্রসন্ন আপাততঃ একাই কর্ম্মস্থানে যাত্রা করুন। ছেলেপিলেরা ইতিমধ্যে আরও একটু ভাল করিয়া স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন করিয়া লউক। রামপ্রসন্নের একলা যাইবার বড় ইচ্ছা ছিল না। স্ত্রীর সহিত এরূপ মনের মিল বিবাহের প্রথম

বৎসরেও হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এই যে দীর্ঘকাল একত্র বাস সে ত শুধু কাছাকাছি থাকিয়া 'ঘর-কন্না' করা বই ত নয়। অনাবিল দাম্পত্যপ্রেমের আস্বাদনের জন্য তাঁহার তৃষিত হৃদয় বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হইলে কি হইবে, "নিয়তি কেন বাধ্যতে?" রামপ্রসন্ন উপায়ান্তর না দেখিয়া একাই রওয়ানা হইলেন। এখন পত্নীবিরহেও তাঁহার স্থৈর্য্য হারাইবার বড় সম্ভাবনা ছিল না, চিরপোষিত অভীষ্ট সিদ্ধি ও গার্হস্থ্য জীবনের এই নবীন প্রীতি সদাই তাঁহার হৃদয় অভিনব সুখ স্মৃতিতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে একখানি বাড়ী পাওয়া গেল। এমন সুবিধার বাড়ী সহজে দেখা যায় না—যেন তাঁহাদেরই ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত। বনেদী ফ্যাসনের বড় হলঘর। গৃহস্বামীর সরকারী কাজকর্ম্মের জন্য আলাহিদা একটি ঘর, স্ত্রী ও কন্যার জন্য দুইটী পৃথক্ পৃথক্ কামরা, ছেলের পড়িবার ঘর—কিছুরই অভাব নাই। বাড়ীখানির সুবন্দোবস্ত দেখিয়া রামপ্রসন্ন মুগ্ধ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরগুলি সাজাইবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুন্দর সুন্দর চেয়ার, টেবিল, কার্পেট, পর্দ্দা ঝালর, সতরঞ্চ প্রভৃতি কত কি আস্‌বাব আসিয়া পড়িল। কোমর বাঁধিয়া মিত্র সাহেব ঘর সাজাইতে লাগিয়া গেলেন। যেখানে যেটী রাখিলে ভাল দেখায়, ঠিক সেইখানেই সেটী সাজান হইতে লাগিল। অর্থাভাবে এতদিন যে রুচি ও সৌন্দর্য্য-বোধ মনের নিভৃত কোণে লুকাইয়াছিল, তাহা স্বতঃই আত্ম-প্রকাশ করিয়া ক্রমশঃ যেন স্বেচ্ছামত মনোমদ

মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতে লাগিল। কার্য্য অর্দ্ধ সমাপ্ত হইতে না হইতেই রামপ্রসন্ন দেখিলেন, যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা গৃহটি আরও অধিক সুন্দরভাবেই সাজান হইতেছে। গৃহস্বামীর মার্জ্জিত রুচির পরিচয় সর্ব্বত্রই বেশ সুস্পষ্ট রূপেই পরিস্ফুট। হলঘরে তখনও হাত পড়ে নাই। সাজান হইলে উহার সৌন্দর্য্য কিরূপ বর্দ্ধিত হইবে তাহা তিনি কল্পনা বলেই অনুভব করিতে লাগিলেন।

কোথায় কৌচ থাকিবে, কোথায় কুশন চেয়ারগুলি রাখা হইবে, কোথায় ছোট মার্ব্বেলের টেবিলের উপর পিতলের পুষ্পাধার সজ্জিত হইবে, দেওয়ালে কোথায় কোথায় ছবি এবং কোথায় কোথায় ফার্ণ পাত্র বিন্যস্ত হইবে মনে তাহা যেন আপনা হইতেই ঠিক হইয়া গেল।

রামপ্রসন্নের স্ত্রী ও কন্যা উভয়েরই সৌখীনতার অভাব ছিল না, সুতরাং তাহারা যে এই সকল গৃহসজ্জা দেখিলে আনন্দিত হইবে, ইহাতেই সদ্য পদোন্নতি গৌরবমুগ্ধ রামপ্রসন্নের কতই না তৃপ্তি অনুভব হইতে লাগিল। সেই সময় ভাগ্যক্রমে নিলামে কতকগুলি সেকেলে ধরণের ঘর সাজাইবার উপকরণ সস্তায় মিলিয়া গেল। রামপ্রসন্ন ভাবিলেন এইবার মণি-কাঞ্চনে সংযোগ হইল। বৈঠকখানাটী দেখিয়া এখন প্রকৃতই বনেদী ধনীগৃহের ন্যায় বোধ হইবে। মিত্রজা এই সকল সাজ-সজ্জার কথা ঘুণাক্ষরেও চিঠিপত্রে লিখিতেন না। তাহারা আসিয়া হঠাৎ বৈঠকখানা প্রভৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। রামপ্রসন্ন ঘর সাজাইতে এরূপ মগ্ন হইলেন যে এখন আর

আফিসের কাজেও পূর্ব্বের ন্যায় মন বসিত না। "আদালতে যখন পুরাদস্তুর উকিলের বক্তৃতা চলিত তিনি তখন অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে থাকিতেন যে কার্ণিশের কাছে কিরূপ ভাবে ঝালর লাগাইলে পর্দ্দাগুলির সহিত জালরূপ মানায়। একদিন মিত্র সাহেবের ঝোঁক হইল যে তিনি নিজেই বৈঠকখানাটী সাজাইবার ব্যবস্থা করিবেন। মইয়ে উঠিয়া মজুরদের দেখাইয়া দিতে গিয়া হঠাৎ পা ফস্কাইয়া গেল, রামপ্রসন্ন মেজেয় পড়িয়া গেলেন। ছেলেবেলায় খেলাধূলা জিম্নাষ্টিক্ প্রভৃতি অভ্যাস ছিল; পড়িবার সময় ঝোঁক্ সাম্‌লাইয়া লওয়াতে সেরূপ গুরুতর আঘাত লাগিল না, কোমরের নিকট একটু বেদনা হইল মাত্র। রামপ্রসন্ন সেটাকে মোটেই গুরুতর বলিয়া মনে করিলেন না। মন প্রফুল্ল থাকায় শরীর বরং তখন ভাল বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। স্ত্রীকে চিঠি লিখিলেন "আমার যেন ১৫ বৎসর বয়স কমিয়া গিয়াছে।" অক্টোবরের মাঝা-মাঝি বাড়ী সাজান সারা হইবে বলিয়া স্থির ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ আরও একমাস দেরী পড়িয়া গেল। যাহা হউক বিলম্বে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিল না। সুবিন্যস্ত দ্রব্যাদির সৌন্দর্য্য বরং আরও চিত্তাকর্ষক বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। যাহারা দেখিল, সকলেই গৃহসজ্জার তারিফ্ করিতে লাগিল। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ধনীর বিলাসিতার অনুকরণ করিতে গেলে সাধারণতঃ যেরূপ ঘটিয়া থাকে রামপ্রসন্নের নূতন গৃহেও তাহা অপেক্ষা বিশেষ কিছু বাহার হয় নাই। এরূপ মেকী বড়মানুসী সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। সেই

সস্তায় খরিদ নকল আবলুস কাঠের সৌখীন আস্‌বাব, চিকণের কাজওয়ালা ফুলতোলা নকল রেশমের পর্দ্দা, রঙ বেরঙের অর্দ্ধ মলিন কার্পেট, সেই পিতল ও ব্রঞ্জ প্রভৃতির দ্রব্যাদির অপূর্ব্ব খিচুড়ী, বিলাসব্যসনে নিম্নতর শ্রেণীর ধনগর্ব্বিত আভিজাত্যের সহিত পাল্লা দিবার এই বৃথা চেষ্টা—পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনবৎ সর্ব্বত্রই ব্যর্থ ও হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছিল। যখন রেলষ্টেশন্ হইতে মেয়েদের সঙ্গে করিয়া নূতন গৃহে আনা হইল তখন সন্ধ্যাকাল। পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত প্রস্তুত ছিল। ঘরে ঘরে উজ্জ্বল আলোক, চারিদিকে দেওয়ালে লতাপাতার বিচিত্র সৌন্দর্য্য। রঙ্গিন আচকান্ গায় হিন্দুস্থানী চাকর সেলাম করিয়া বড় বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিল। সাজগোজের সুব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে সময়ে আর মিত্রজার আহ্লাদ দেখে কে? তিনি স্ত্রীপুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক ঘর দেখাইতে লাগিলেন—তাহাদের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন আনন্দের জ্যোতিঃ ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় চা খাইতে খাইতে হিমানী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি নাকি ঘর সাজাইতে গিয়া আঘাত পাইয়াছ?" রামপ্রসন্ন শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন—পরে কিরূপে মই হইতে পা পিছ্‌লাইয়া গিয়াছিল এবং মিস্ত্রী ও মজুরেরা কিরূপ ভয় পাইয়াছিল তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া ছেলেবেলার ব্যায়ামের কথার উল্লেখে রহস্যচ্ছলে বলিতে লাগিলেন—"জিম্নাষ্টিক্ শিখিয়াছিলাম বলিয়াই সে দিন আমার জীবন নষ্ট হয় নাই। আর কোনও গোবরগণেশ বাবুভায়া হইলে আর দেখিতে হইত

না। সে রকম বিশেষ কিছু গুরুতর আঘাত লাগে নাই। সামান্য একটু নোনূছা গিয়াছিল মাত্র। এখনও কাল্‌শিরা পড়িয়া আছে, হাত দিলে, অল্প বেদনা বোধ হয়।"

এইরূপে নূতন স্থানে নূতন করিয়া গৃহস্থালী আরম্ভ হইল। দুই এক দিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইল যে নূতন বাটীতে সবই সুপ্রতুল বটে, কেবল একখানি মাত্র ঘরের অভাব। ভাণ্ডার ঘরের কথা এ যাবৎ কাহারও মনে পড়ে নাই। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ভাল করিয়া গুছাইয়া না বসা পর্য্যন্ত ঘরদ্বারের সুবিধা অসুবিধা বুঝিতে পারা যায় না। যে বেতন বৃদ্ধির জন্য এত আনন্দ মাসকাবারের পর দেখা গেল তাহাতেও কুলাইয়া উঠে না। চাকুরে লোকের মাহিনা বৃদ্ধির সঙ্গে সংসার-খরচের কবেই বা সামঞ্জস্য হইয়া থাকে? সুখের মধ্যে এই যে এবার বেশী অভাব হইল না, উঠনার বাবৎ মুদীর দোকানে মাত্র ৫০৲ টাকা বাকী পড়িয়াছে দেখা গেল। মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীর তাহাতে আর বিশেষ কি আসিয়া যায়? বড়মানুষী চালে চলিতে গেলে এরূপ তো সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও প্রথম কয় সপ্তাহ বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। তখনও সাজান গোছান খরিদপত্তরের অল্প কিছু বাকী ছিল। মেয়েছেলেরা তাহা লইয়াই মাতিয়া রহিল। এখনও স্বামী-স্ত্রীতে সামান্য সামান্য মতভেদ উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু সাংসারিক কাজে সত্য সত্যই ব্যস্ত থাকিলে আর সেরূপ ভাল করিয়া ঝগড়া করার সুযোগ ঘটিয়া উঠে কই?

গৃহস্থালীর সুব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিনগুলি হিমানীর আবার এক ঘেয়ে গোছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সদাই যেন কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। ক্রমশঃ পাড়াপড়্‌শী, ও স্থানীয় ভদ্রগৃহস্থের পরিবারেরা আসা যাওয়া সুরু করিলেন; তাঁহাদের সহিত আলাপ আপ্যায়িতে সময় আবার পূর্ব্বের ন্যায় নিস্পরোয়া ভাবেই কাটিতে লাগিল।

তখন গ্রীষ্মকাল। সকালে কাছারী হইত। রামপ্রসন্ন মধ্যাহ্নে বাড়ী ফিরিয়া আহারাদি সমাধা করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেন। প্রথম কয় সপ্তাহ বেশ ভালয় ভালয় চলিয়া গেল, তবে মধ্যে মধ্যে বাড়ী সাজান বা ঘরসংসারের সুবিধা-অসুবিধা লইয়া এক আধবার খিটিমিটি বা মন কষাকষি যে না হইত তাহা নহে, কিন্তু তাহা ক্ষণিকমাত্র। এই বাড়ী সাজান লইয়া রামপ্রসন্ন একপ্রকার পরিচ্ছন্নতা-বায়ুগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। টেবিলক্লথে (টেবিলের আস্তরণে) বা চেয়ারের গদিতে দাগ দেখিলে বা পর্দ্দার দড়ি ছিঁড়িয়া সামান্য কোন অংশ বাহির হইয়া গেলে তিনি একেবারে রাগিয়া আগুন হইয়া যাইতেন। বাড়ী সাজান লইয়া এতই পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে কোথাও সামান্য কিছুর ব্যত্যয় দেখিলেই তাহার মনে বড় কষ্ট বোধ হইত। এই সকল সামান্য একটু আধটু গণ্ডগোল ছাড়া এ সময় তাঁহার জীবন মোটের উপর সুখেই কাটিতেছিল বলিতে হয়।

রামপ্রসন্নের উঠিতে একটু দেরী হইত। সাতটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়াই প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া চা-খাইতে খাইতে

খবরের কাগজ পাঠ এবং তাহার পর পোষাক পরিয়া আফিসে রওনা। আফিসে পঁহুছিয়া অর্থী প্রত্যর্থীর আবেদন গ্রহণ, পুরাতন মাম্‌লা মোকর্দ্দমা শুনানি ও সর্ব্বশেষে আফিসের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন ও চিঠি পত্র দস্তখৎ। দিনগুলি এই সব কাজের ভিতর "হু হু" করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল। যে সব কারণে এই নিয়মবদ্ধ কর্ম্মজীবনের ব্যাঘাত ঘটে তাহা রামপ্রসন্ন কোন মতেই সহজে ঘটিতে দিতেন না। একবার আফিসে বাহির হইয়া গেলে সরকারী কাজ কর্ম্মছাড়া আর কোনও ব্যাপার লইয়া লোকের সহিত তাঁহার আর কথাবার্ত্তা চলিত না। যদি কোনও দরখাস্তকারী নিজের ব্যক্তিগত কথা লইয়া উপস্থিত হইত রামপ্রসন্ন তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না, কিন্তু কাহারও কোন সরকারী কার্য্য বা মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে আইনসঙ্গত আবেদন থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাহ্য করিয়া হাসিমুখে আবশ্যক হুকুম লিখিয়া দিতেন বা ছাপা ফরম্ প্রভৃতি পূরণ করার ব্যবস্থা করিয়া যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন। তখন তাঁহার ব্যবহার বড়ই অমায়িক বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সরকারী কার্য্যের সম্বন্ধ চুকিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই মিত্রজা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। বৃথা মেলা-মেশার তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। বহুকার্য্যের মধ্য হইতে নিজের ব্যক্তিগত জীবন তফাৎ করিয়া রাখিতে তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। মনে হইত আফিসে যে মানুষ, বাড়ীতে যেন সে-মানুষই নহে। কালে দুই দিক বজায় রাখিতে তাঁহার এইরূপ দক্ষতা জন্মিয়া গেল যে কখনও কোন স্থলে সরকারী ও বে-সরকারী কর্ম্ম-

সূত্রের গুচ্ছগুলি একত্র জড়াইয়া পড়িলে তিনি আবশ্যক হইলেই পদগৌরবের পরদার আড়ালে আশ্রয় লইয়া যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সরকারী কার্য্য নির্ব্বিবাদে চালাইবার এরূপ কৌশল খুব অল্প লোকেরই আয়ত্ত হইতে দেখা যায়। রামপ্রসন্ন আফিসে শুধু কাজ লইয়াই থাকিতেন না। অবসর পাইলে টিফিনের সময় পাঁচজন হাকিমের সহিত গল্প-গুজব রাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা যে না চলিত তাহা নহে। তবে মরশুম মাফিক্ প্রমোশনের কথা উঠিলেই তাঁহাদের খাস কামরার আড্ডাটি খুব জমিয়া যাইত। এ ছাড়া সকাল সকাল ছুটি হইলেই বন্ধুসমাজে তাস খেলার ধূম পড়িত। আফিস করিয়া বাড়ী ফেরার পর মিত্র মহাশয়ের শরীরটা যেন মধ্যে মধ্যে একটু দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইত বটে, কিন্তু এ ক্লান্তির ভিতরেও কিঞ্চিৎ আত্মগরিমার রেশ থাকিত বলিয়া মনটা সেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িত না। রাজকার্য্যে আমার সমকক্ষ আর কেহই নাই এ বিশ্বাস অনেক সময় রীতিমত টনিকের কার্য্য করিয়া থাকে। মিত্রজা বাড়ী ফিরিয়া প্রায়ই দেখিতেন গৃহিণী সকন্যা হয় তো পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছেন। ছেলেটী হয় তো স্কুল হইতে ফেরে নাই কিংবা বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে পড়িতেছে, কখনও বা দেখিতেন কোনও ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন।

রামপ্রসন্নের পড়াশুনার বড় অভ্যাস ছিল না। তবে হালফ্যাসানের শিক্ষিত লোকের মত তিনিও নামজাদা গ্রন্থকারের

দু'চারখানা চলতি বই খরিদ করা বাজে খরচ বলিয়া মনে করিতেন না। তবে বই কিনিলেই যে পড়িতে হইবে এমন কোন কথা ত নাই। ভাল বাঁধা বইগুলি সেল্‌ফে সাজান থাকিত, যদি কোনও দিন ইচ্ছা হইত মিত্রসাহেব যে কোনও একখানি টানিয়া লইয়া দুই এক পাতা উলটাইতেন। সন্ধ্যার পর প্রায়ই মোকর্দ্দমার নথি পত্র লইয়া আবশ্যক অংশগুলি দাগ দিয়া রাখিতেন কখনও বা কাগজে তাহার সারাংশ নোট্‌ করিয়া লইতেন। এইরূপে মাল-মসলা প্রস্তুত হইলে হু হু করিয়া রায় লেখা আরম্ভ হইত—সময় তর্‌ তর্‌ করিয়া কাটিয়া যাইত। সারাদিন খাটুনির পর পুনরায় এইরূপ নথি পত্র ঘাঁটা সাধারণের নিকট ভীতিপ্রদ হইলেও তাঁহার কাছে ইহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত না। স্ত্রীর সহিত বসিয়া সাংসারিক কথাবার্ত্তায় সময় ক্ষেপণ অপেক্ষা রায়-লেখাই বরং রামপ্রসন্নের ভাল লাগিত। যদি কোনও দিন ক্লান্তি বোধ হইত, তাহা হইলে দুই এক বাজি তাস খেলিলেই মন চাঙ্গা হইয়া যাইত। আবশ্যক হইলে এ হেন অমোঘ ঔষধ প্রয়োগে প্রায়ই বিলম্ব ঘটিত না। মধ্যে মধ্যে দু'পাঁচ জন গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানও তাঁহার অভ্যাস ছিল। ভাল সাহেবী খানার ব্যবস্থা করিলে অনেক উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুসন্তান অহিন্দুর বাটীতে পদার্পণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। মিঃ মিত্র খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন বেশ পরিপাটী রকমেরই করিতেন। সেই জন্য তাঁহার বাটীতে ডিনারের খুব সুখ্যাতি ছিল। খানায় বসিবার আগে পাঁচ

বন্ধুতে মিলিয়া গানবাজনায় গল্পামোদে সময় বেশ কাটিয়া যাইত।

একবার তিনি সান্ধ্যভোজনে কতকগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেদিন মেজাজটাও বেশ ভালই ছিল। বেশ হাসিখুসিতেই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন চলিতেছিল। হঠাৎ তাঁহার স্ত্রীর সহিত মিষ্টান্ন প্রভৃতির ব্যবস্থা লইয়া বিশেষ মতভেদ উপস্থিত হইল। স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও রামপ্রসন্ন ভাল সাহেবী হোটেল হইতে কেক্ প্রভৃতি আনিবার জন্য কলিকাতায় লোক পাঠাইয়াছিলেন। খরচ পড়িল প্রায় ৫৫৲ মুদ্রা। হিমানীর ইহা আর সহ্য হইল না, তিনি সেই দিনকার অনুষ্ঠান শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্বামীকে ইতর ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন। রামপ্রসন্ন ক্রোধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। কেবল অর্দ্ধোচারিত ভাষায় বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবেন এইরূপ আভাস দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। ঝগড়া, মনান্তর যাহাই হউক সেবারকার সান্ধ্য-সম্মিলনে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন বড় মন্দ হয় নাই। যাঁহারা আসিয়াছিলেন সকলেই বেশ আপ্যায়িত হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আপন আপন ঘরে ফিরিয়া গেলেন। মেয়েদের জন্য পর্দ্দাপার্টিরও ব্যবস্থা ছিল। তাহাতে একজন "দানশৌণ্ড" জমিদারের ভগ্নীও আসিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সুতরাং রামপ্রসন্নের কোন আয়োজনই যে ব্যর্থ হয় নাই এ কথা বলাই বাহুল্য।

মিত্র সাহেব আফিসের কাজে যে আনন্দ পাইতেন তাহা আত্ম-

প্রসাদ বা আত্মপ্রীতিরই রূপান্তর মাত্র। আর সামাজিক ব্যাপারে যেটুকু আমোদ-আহ্লাদ তাহা শুধু তাঁহার বৃথা গর্ব্ব ও আত্মম্ভরিতারই পূর্ণ সংস্করণ। সুখ বলিতে যাহা কিছু ছিল তাহা কেবল তাস খেলায়। এই সুখটী যেমন অনাবিল তেমনি বিশেষভাবে তাঁহার নিজস্ব। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত যে জীবনের সকল প্রকার ঝঞ্ঝাবাত ও অপ্রীতিকর ঘটনার ভিতর তিনজন ভাল খেলোয়াড়কে লইয়া আড্ডা-ঘরের সবুজ বনাতমোড়া টেবিলটীতে তাস খেলিতে বসিয়া যাও—ব্যস্ দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া যাইবে—ভাবনা চিন্তা মনঃকষ্ট সব কোথায় পলায়ন করিবে। তবে খেলোয়াড় কয়টী ভাল হওয়া চাই। যাহারা রংএর হিসাব মনে রাখিতে না পারিয়া হঠাৎ চটিয়া যাইয়া গোলমাল বাধাইবার উপক্রম করে তেমন লোক থাকিলেই সব মাটী। চার'জনের জায়গায় পাঁচজন হইলেই রসভঙ্গ হইয়া যায়। ফালতু' লোকটির অপর একজনের পিছনে বসিয়া তাহার হাত দেখা ছাড়া উপায় থাকে না। মুখে যে যতই বলুক না কেন এরূপ ভাবে খেলিতে বসা কাহারও পক্ষে সুখকর নহে। দর্শকের অবস্থা কি কাহারও অধিকক্ষণ ভাল লাগিতে পারে? ভাল খেলোয়াড় যোগাড় করাই আসল কথা। যদি খেলায় পিঠ্ পিঠ্ জিত হয় এবং সেই সঙ্গে রাত্রে আহারের যদি একটু ভাল বন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে বেশ প্রসন্ন মনেই শয্যাগ্রহণ করিতে পারা যায় এবং সুনিদ্রাও আপন হ'তেই অক্ষিপক্ষ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে অধিক কিছু বাজী রাখিয়া খেলাটা বড় সুবিধার নয়। খেলিতে বসিয়া যদি টাকা

পয়সার দিকেই ভদ্রসন্তানের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে জুয়া হইতে আর তাস খেলা তফাৎ থাকিল কি? রামপ্রসন্ন দুঃখ করিতেন যে ব্রিজের tricks-এর হিসাব রাখিতে রাখিতে ক্রমশঃ ভদ্রসমাজেও জুয়াড়ীর ভাবটা আসিয়া পড়িতেছে।

মিঃ মিত্র সপরিবারে এই ভাবেই জীবনযাপন করিতেছিলেন। তাঁহারা যে দলে মিশিতেন সেখানে সভ্যভব্য মান্যগণ্য ব্যক্তি ছাড়া অপর কাহারও স্থান ছিল না।

কন্যা থাকিলেই জামাতার সন্ধান করিতে হয়। সুতরাং মিত্র সাহেবের সামাজিক আমন্ত্রণে স্বধর্ম্মাবলম্বী দুই একজন যুবকেরও শুভাগমন ঘটিতে লাগিল। স্বামী-স্ত্রী পুত্রকন্যার আর যতই মতভেদ থাকুক না কেন, কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোককে যে তফাৎ রাখিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য ঐক্য দেখা যাইত। পুরাতন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ অনেকেই এখন স্বার্থের খাতিরে মিত্র সাহেবের গৃহে আসিয়া ভিড় বাধাইবার চেষ্টা করিত।

জাপানী ফুলদানী সাজান সখের বৈঠকখানায় এ শ্রেণীর জীব মানাইবে কেন? এসব আদব-কায়দাশূন্য নামযশবিহীন মানুষের ভদ্র-সমাজে পরিচয় দেওয়াই ভার। তাই কর্ত্তাগৃহিণী স্থির করিলেন ইহাদের আর "নাই" দেওয়া হইবে না। কিছু দিন পরেই এ সকল লোক ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। মিত্র-গৃহে অর্দ্ধমলিন বেশভূষা, ফ্যাসান বিবর্জ্জিত জামা কাপড় আর বড় দেখা যাইত না। নীর বাদ দিয়া ক্ষীরটুকুই অবশিষ্ট রহিল। এখন যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা চলিতে লাগিল তাহারা সকলেই

সমাজের উচ্চস্তরের লোক। যুবকদলের অনেকেই গৃহস্বামীর কন্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রের ন্যায় আর কেহই সামাজিক শিষ্টাচারের ভিতর দিয়া সেরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হয়েন নাই। শ্রীমান্ অতুল ওরফে A. C. Basu Esqr. এ, সি, বসু এ'স্কোয়ার নব্য ডেপুটি। ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতা কলিকাতার বনিয়াদী বংশের ছেলে। যখন হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজ একতাবদ্ধ হইয়া "কনভার্ট-লোলুপ" খৃষ্টীয়ানীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিল সেই সময়ে কোন উদারহৃদয় ইউরোপীয় অধ্যাপকের চরিত্র গুণে মুগ্ধ হইয়া অতুলের পিতা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধটী রামপ্রসন্নের বেশ মনোমতই হইয়াছিল। অতুল বাবাজীর শুভাগমন হইতে তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন এক রকম শান্তিতেই কাটিতে লাগিল। উপস্থিত আর গোলমাল ঝগড়া-ঝাঁটি কিছুই চলিতেছিল না। নিরুদ্বেগে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে মিত্রপরিবারের সংসারযাত্রা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের আদব-কায়দাতেই যথারীতি নির্ব্বাহিত হইতেছিল।

৪

আপাততঃ মিত্রগৃহে অপর কাহারও শরীর বড় অসুস্থ ছিল না, কেবল রামপ্রসন্ন মাঝে মাঝে বলিতেন যে সকাল বেলায় মুখটা কেমন বিস্বাদ হইয়া থাকে, আর পেটের বাম দিকটায় কেমন যেন ভার ভার বোধ হয়। সকলেই জানিত সামান্য একটু কিছু হইলেই মিত্রজার তাহা লইয়া তোলাপাড়া অভ্যাস, সেইজন্য

তাঁহার কথায় কেহ তখন বড় একটা কর্ণপাত করিত না। কিন্তু মিত্র মহাশয়ের প্রায়শঃ কাল্পনিক অসুখগুলি যেমন দুদিন পরেই আপনা হইতেই উপশম হইয়া যাইত, এটির বেলায় সেরূপ হইতে দেখা গেল না। যন্ত্রণা অসহ্য না হইলেও পেটের বেদনায় তাঁহার সর্ব্বদাই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইত। উঠিতে বসিতে কিছুতেই যেন আর শান্তি মিলিত না। এইরূপ—অচিকিৎসায় রোগ ভোগ করিয়া রামপ্রসন্নের অমন ঠাণ্ডা মেজাজও ক্রমশঃ খিট্‌খিটে হইয়া উঠিল, ফলে গৃহিণীর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথায় কথায় মনান্তর আরম্ভ হইল, থাকিল কেবল অপরিচিতের সমক্ষে বাহ্যিক শিষ্টতার একটা ক্ষীণ আবরণ মাত্র। হিমানীর সহ্যগুণ কোন কালেই অধিক নহে, তাহার উপর আবার কথায় কথায় স্বামীর মুখঝাপ্‌টা। আগে কলহের সূত্রপাত হিমানী হইতেই হইত, এখন দাঁড়াইল ঠিক তাহার বিপরীত। এখন সুবিবেচক স্থিরবুদ্ধি রামপ্রসন্নই কোন্দলে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ঝগড়াঝাঁটির পরও ছেলেদের কথা বা গৃহস্থালীর বিষয় লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে স্থিরভাবে কথাবার্ত্তা চলিত, কিন্তু এখন আর এ কলহ-সাহারায় শান্তির উৎস খুঁজিয়া পাইবার উপায় ছিল না। এখন রামপ্রসন্নের বিশ্রী মেজাজের নিন্দা করিলে অন্তরঙ্গ বন্ধুসমাজে আর কেহই তাহার প্রতিবাদ করিত না, সুতরাং আত্মীয়বন্ধুগণের নিকট মিত্র-গৃহিণীর নিজপক্ষসমর্থনের বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। হিমানী যখন রঙ চড়াইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিত যে সে হেন মেয়ে বলিয়াই এরূপ নিষ্ঠুর ও হীনচরিত্র পুরুষকে লইয়া এই বিশ

বৎসর কাল ঘর করিতেছে, তখন তাহার নবপরিচিতা সখীগণ সোৎসাহে মিত্র-জায়ার গুণপনা স্বীকার করিয়া স্ত্রীজাতির মুক্তি-কল্পে ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলে নানারূপ প্রস্তাবের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।

প্রায় আহারের পূর্ব্বেই সামান্য কিছু লইয়া গোলমাল উপস্থিত হইত; হয় ত থালাটা ভাল করিয়া মাজা হয় নাই কিংবা অনবধানতায় পড়িয়া টোল খাইয়াছে এইরূপ একটা তুচ্ছ ছুতা ধরিয়া রামপ্রসন্ন বকাবকি করিতেন; ক্রমে তাহা হইতে রান্নার দোষ, ছেলের অশিষ্ট ভঙ্গীতে খাইতে বসা, মেয়ের বিশ্রী বিলাতি ফ্যাসানে চুলবাঁধা প্রভৃতি নানাকথা আসিয়া পড়িত;—ঝোলের বাটি হয় তো পাতের গোড়াতেই পড়িয়া রহিত, আধ খাওয়া করিয়াই সকলে উঠিয়া পড়িত।

কথায় বলে "যত দোষ নন্দ ঘোষ।" যা কিছু 'ঝক্কি' সব গিয়া পড়িত হিমানীর উপর। হিমানী প্রথমাবস্থায় এরূপ অন্যায় ব্যবহারে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্বামীকে দু'কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িত না কিন্তু প্রতিনিয়তই আহারের পূর্ব্বে যখন এরূপ পারিবারিক অশান্তির সূত্রপাত হইতে লাগিল, তখন তাহার বিশ্বাস জন্মিল যে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি ব্যাধিই বোধ হয় এ দুর্ব্যবহারের মূলীভূত কারণ। সে অবধি সে আর বৃথা গোলমাল না করিয়া—ছেলেদের তফাৎ রাখিয়া যথাসম্ভব নিরুপদ্রবে তাড়াতাড়ি আহার সমাধার ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট থাকিত।

হিমানী মনে করিত, তাহার এই অসাধারণ ধৈর্য্যগুণ—

নির্ব্বিবাদে নির্যাতন সহ্য করার এই যে ত্যাগ স্বীকার তাহা নেহাৎ জলে ফেলা হইতেছে—প্রশংসা পাওয়া ত দূরের কথা এদিকে কেহ লক্ষ্যও করিতেছে না। রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায়—রুদ্ধবাষ্প কামিনীর ক্রোধানলে—সাংসারিক জীবন—তাহার নিজের পক্ষেই—দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল।

একবার একটা বড় রকম ঝগড়ায় স্ত্রীর প্রতি বিশেষরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়া রামপ্রসন্নের হঠাৎ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল—তিনি কলহান্তে হিমানীকে জানাইলেন যে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতাই তাঁহার এরূপ মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে—শরীরের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার সুখশান্তি সমস্তই নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

হিমানী বলিল—"তোমার যদি সত্য সত্যই অসুখ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভাল একজন ডাক্তারকে দেখাও না কেন? মিছামিছি আমাকে জ্বালাইয়া আর লাভ কি?"

অবশেষে পত্নীর পরামর্শ মত কয়েক দিনের ছুটি লইয়া কলিকাতার কোনও খ্যাতনামা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই স্থির হইল।

রামপ্রসন্ন কলিকাতায় আসিলেন—আসিয়া ডাক্তার দেখাইয়া বুঝিলেন—যাহা ভয় করিয়াছিলেন ঘটিয়াছেও তাহাই। নামজাদা ডাক্তারের বাটিতে রোগ দেখাইতে আসিলে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু সাক্ষাৎ মিলে না। অনেকক্ষণ 'বার' দিয়া বহির্দ্দেশে বসিয়া থাকিতে হয়, তাহার পর ভিতরে তলব। কোর্টে হাকিমদিগের

যেরূপ ভাবভঙ্গী সমাগত রোগীদিগের নিকট বড় ডাক্তারের ব্যবহারও অনেকটা সেইরূপ। সেই "বড় কেও কেটা নয়" মুরুব্বিয়ানা চালে প্রবেশ—তাহার পর মাত্র কয়েকবার উদরে বা বক্ষে অঙ্গুলীদ্বারা আঘাত করিয়া সেই আদালতের কায়দায় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন—তাহার অনেকগুলিরই জবাব ভিষক মহাশয়ের যেন পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে—তবে জিজ্ঞাসাটা যে করিতেছেন সেটা কেবল করিতে হয় বলিয়া!

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা সাধারণতঃ রোগের নিদান লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। রোগীর অবস্থা বিপজ্জনক কিনা এ সব সামান্য বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার তাঁহাদের অবসর থাকে না। এই সকল বহু উপার্জ্জনশীল চিকিৎসক মহাশয়দিগের আকার ইঙ্গিতে ও কথার মর্ম্মে সহজেই বুঝা যায়, রোগলক্ষণাদির কথা অধিক বলিয়া তাঁহাদের কষ্ট দেওয়া নিরর্থক, তাঁহাদের সবই তো জানা আছে, রোগের কথা আর তাঁহারা নূতন করিয়া শুনিবেন কি? তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া যাহা বলিয়া দিবেন, তাহাই বেদবাক্য জ্ঞানে পালন করিতে থাক, পরে যাহা জানিবার আবশ্যক হইবে, পুনরায় দর্শনী দিয়া জানিয়া যাইও।

রামপ্রসন্ন স্থূলবুদ্ধি নহেন, তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। উঠিয়া আসিবার সময় ডাক্তারবাবু বলিলেন—"ব্যস্ত হইলে চলিবে না—রোগের কাছে কি ছোট বড়'র ভেদ আছে।" শুনিয়া রামপ্রসন্নের বিচারালয়ে বহুবার প্রযুক্ত নিজের একটি প্রিয় উক্তি স্মরণ হইতে লাগিল—"বিচারকের কাছে আবার

পদমর্য্যাদার গৌরব কি? আইনের চক্ষে ছোট বড় সবই সমান।” মনে পড়ে ডাক্তারের ন্যায় কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকেও কতবার এই প্রকার অনাবশ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে—আসামীগণের উত্তর জানাই আছে, পাঁচজন উকিল তাহাদের পক্ষে মজুদ, তবুও নিস্তার নাই, বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব লিখিতে হইবে—এম্‌নি আদালতের কানুন!

তিনি বাহির হইয়া আসিলে ডাক্তার যখন নিজ সহকারীর সহিত তাঁহার পীড়ার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন, তাঁহার মনে হইল জজ সাহেব যেন দায়রার মাম্‌লায় জুরিগণকে (jurors) চার্জ্জ বা অভিযোগ বুঝাইয়া দিতেছেন। রামপ্রসন্ন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইতেছিলেন ডাক্তার বলিতেছেন যদি এই এই লক্ষণগুলি মিলিয়া যায় তাহা হইলে দেহের ভিতরকার যন্ত্রাদির বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (ভজকট ডাক্তারি পরিভাষার রামপ্রসন্ন ঠিক অর্থ বোধ করিতে পারিলেন না) আর যদি পুনরায় প্রশ্নের ফলে যদি রোগীর এই সকল যুক্তি না টেঁকে, তাহা হইলে আর এ নিদানে চলিবে না—রোগের ব্যবস্থা তখন অন্যরূপ করিতে হইবে। আমি এখন অবস্থা দৃষ্টে অমুক ব্যারাম বলিয়াই ধরিয়া লইলাম (পুনরায় ডাক্তার মহাশয় একটি বিদ্‌ঘুটে ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিলেন)। কিন্তু consultation অন্তে অপর কেহ যদি একাকী অন্যমত করেন তাহা হইলে এই সকল হেতুবাদ কাটাইয়া উঠার ভার তাঁহারই উপর, নিজ স্বাপক্ষে প্রমাণ তখন তাঁহাকেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

রামপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন—এ যেন ঠিক সাক্ষীর আইনের burden of proof বা প্রমাণ-ভারের বিচার। কখন্ তাহা আসামীর উপর থাকিবে, কখনই বা তাহা বাদীর উপর গিয়া পড়িবে এ যেন ক্ষেত্রভেদে তাহারই নির্দ্দেশ। রোগটী appendicitis, ভ্রমমান মূত্রাশয় (floating kidney) না ঝিল্লির পুরাতন প্রদাহ (chronic catarrh)—উহা কঠিন কি সহজ, উহাতে জীবনহানির সম্ভাবনা আছে কি না, সে দিকে ডাক্তারের দৃষ্টি নাই—তিনি কেবল নিদানের কূট তর্ক ও সম্ভব্যতার বিবেচনা লইয়াই ব্যস্ত। অবশেষে বিশেষজ্ঞ মহাশয় নিজের বিদ্যাবত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তরুণ সহযোগীটিকে জানাইলেন যে, রোগীর মূত্র পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি যতদূর বুঝিতে পারিতেছেন তাহাতে রোগটী appendicitis বলিয়াই তাঁহার ধারণা, তবে মূত্র পরীক্ষান্তে যদি কোনও অচিন্তিতপূর্ব্ব নূতন লক্ষণ ধরা পড়ে, তখন আবার এ সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচার করা যাইবে।

রামপ্রসন্নের মনে হইতে লাগিল, আসামী "শশকের" সম্মুখে সুশিক্ষিত সারমেয়ের ন্যায় স্বীয় আইনঘটিত বিদ্যা লইয়া ভাঁটা খেলিয়া তিনিও এইরূপ ভাবে কতই না নিজের গুণপনা জাহির করিয়াছেন—কাঠগড়ায় আবদ্ধ অপরাধীর তখন মানসিক অবস্থা কিরূপ তাহা একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই। তিনি যেরূপ মোকর্দ্দমার শুনানি শেষ হইলে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সোণার চশমার ভিতর দিয়া নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে আসামীর দিকে সগর্ব্বে

চাহিয়া দেখিতেন আজ এই দেশবিখ্যাত চিকিৎসকটিও consultation সমাপনান্তে তাঁহার হাতে ব্যবস্থা পত্রখানি দিবার সময় ঠিক যেন সেইরূপ সহানুভূতিহীন দৃষ্টিতেই তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

চিকিৎসক-দ্বয়ের রোগ নির্ণয় যুক্তি প্রসঙ্গে—অতর্কিতে ব্যাধির ক্রম বৃদ্ধির বিবরণ শুনিয়া রামপ্রসন্ন বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা যে বড় আশাপ্রদ নহে এ সংবাদ তাঁহার নিকট যতই কষ্টকর হউক না কেন চিকিৎসকের বা অপর কাহারও তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইতেছে না, এই কথাই তাঁহার বার বার মনে হইয়া বড়ই চিত্ত বিক্ষোভ উপস্থিত করিল। এই মনঃ-পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতিশূন্য ডাক্তারটির প্রতিও তাঁহার এক বিজাতীয় ক্রোধ উপস্থিত হইল যেন সেই এ রোগের একমাত্র কারণ!

রামপ্রসন্ন মনোভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর দর্শনীর ষোলটি টাকা গুণিয়া রাখিয়া ডাক্তার পুঙ্গবকে নিতান্ত বিনীতভাবে বলিলেন—"মহাশয়! রোগীরা মনের চাঞ্চল্যে অনেক সময় অনেক অযথা প্রশ্নও না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারে না। যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া এ রোগে বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা বলিয়া দেন তাহা হইলে বড়ই বাধিত হই।" চিকিৎসক মহাশয় শুনিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধভাবে একবার উহার দিকে চাহিয়া অল্প কথায় উত্তর দিলেন,—"আপনার যেটুকু জানা আবশ্যক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি, যদি আরও কিছু জানিতে চাহেন তাহা হইলে গৃহ-

চিকিৎসককে পরামর্শ করার জন্য পাঠাইয়া দিবেন।" রামপ্রসন্ন যে কলিকাতাবাসী নহেন তিনি যে সুদূর মফঃস্বল হইতে রোগ দেখাইতে আসিয়াছেন একথাও ডাক্তার মহাশয়কে বলিবার অবকাশ ঘটে নাই। রামপ্রসন্নের নিকট এরূপ অপ্রত্যাশিত কঠোর উত্তর বা এপ্রকার রোষকষায়িত অপাঙ্গবেক্ষণ যেন নিজের পূর্ব্ব আচরণেরই প্রতিফল বলিয়া মনে হইতেছিল। আসামীগণ জবাবের সময় মনের আবেগে উচ্চকণ্ঠে দুই চারিটি অবান্তর কথা বলিলে তিনিই না কতবার তাহাদিগকে ধমক দিয়া অনর্থক গোল করার জন্য হাজতবাসের ভয় দেখাইয়াছেন। আজ যেন তাহারই ইহা সুদ সমেত প্রতিশোধ।

ডাক্তারকে নমস্কার করিয়া রামপ্রসন্ন স্খলিতপদে কোনও প্রকারে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দ্বারপার্শ্বস্থ তাঁহার ভাড়াটিয়া ফিটন খানিতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই দেড় ঘণ্টার মধ্যে মহানগরীর বহিঃদৃশ্য যেন হঠাৎ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে—সমস্তই যেন ইন্দ্রজাল বলে পরিবর্ত্তিত। রাস্তায় যাহা কিছু চোখে পড়ে সবই যেন ঘোর নিরানন্দে সমাচ্ছন্ন—চারিদিকেই যেন কেমন একটা দুঃখাভিভূত ভগ্নোৎসাহভাব। সকলেই যেন নিরাশভাবে গতানুশোচনায় নিমগ্ন। ভাড়াটিয়া গাড়ীর standএ (আড্ডায়) ফেজ্ মাথায় গাড়োয়ানগণ অর্দ্ধনিমলীতনেত্রে কোচ-বাক্সে বসিয়া যেন বিষণ্ণতাভাবেই ঝুঁকিয়া আছে। পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকাশ্রেণী রাজপথের পথিকপ্রবাহ সকলই যেন এক অদৃশ্য শোকাস্তরণে আচ্ছাদিত।

গাড়ী বেগে চলিতেছে আর রামপ্রসন্ন মনে মনে ডাক্তারের কথাগুলি স্মরণ করিয়া তাঁহার দুর্ব্বোধ বৈজ্ঞানিক ভাষার তাৎপর্য্য গ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন—কেবলই মনে হইতেছে "ব্যারামটা বড়ই কঠিন—এ যাত্রা বুঝি আর রক্ষা পাইলাম না।" উদরের সেই নিরবচ্ছিন্ন অপ্রখর বেদনা আর মধ্যে মধ্যে অন্ত্র সান্নিধ্যে চর্ব্বণের ন্যায় অনুভূতি ডাক্তারের সেই অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ বাণীর যেন এক ভয়াবহ নূতন অর্থ জ্ঞাপন করিতেছিল। বাড়ী আসিয়া মিত্র মহাশয় সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া সবিস্তারে সকল কথা জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার করুণকাহিনী অর্দ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সুশোভন পরিচ্ছদে ভূষিতা কন্যা প্রেমসুধা আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতার সহিত সে আজ দম্‌দমে কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইবে তাই গাড়ী ডাকাইবে কি টেলিফোন করিয়া ট্যাক্সি আনাইবে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। পিতার অসুখের কথা শুনিয়া সে একবার নিকটে আসিয়া বসিল বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই রোগী-চিকিৎসক সংবাদের সেই একঘেয়ে বর্ণনায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কন্যার ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া মিত্র-জায়াও তাঁহার স্বামীর কথা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তাঁহাকেও বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য গাত্রোত্থান করিতে হইল। যাইবার পূর্ব্বে বলিলেন—"তা বড় ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে এলে ভালই হ'ল। এখন যা ওষুধ করে দিয়েছে তাই আজ থেকে নিয়মমত খেতে আরম্ভ কর। আমাকে বরং প্রেস্কৃপসনটা দাও, আমি

দরওয়ানকে মোড়ের নূতন ডিস্পেন্সারী থেকে ওষুধ আনতে পাঠাই।” রামপ্রসন্ন এতক্ষণ ভাল করিয়া শ্বাস-ত্যাগও করেন নাই পত্নীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে শ্বাসগ্রহণ করিয়া আপন মনে নিজেকেই প্রবোধ দিতে লাগিলেন—মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “মিছামিছি উতলা হই কেন? ব্যারামটা হয় তো সেরূপ কঠিন নহে, কেবল দুর্ভাবনাতেই এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।” রামপ্রসন্ন নিয়ম করিয়া ঔষধ খাইতে লাগিলেন। প্রস্রাব পরীক্ষার ফলে ব্যবস্থা যাহা কিছু পরিবর্ত্তিত হইল তাহাও বর্ণে বর্ণে পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত করিয়াও কোথা হইতে একটা অনর্থ ঘটিয়া গেল—ডাক্তারের উপদেশ ভুল বুঝার ফলেই হউক বা গৃহকর্ত্তার স্মরণাভাবেই হউক কতকগুলি নিয়মসম্বন্ধে বড়ই ব্যত্যয় ঘটিতে লাগিল। রামপ্রসন্ন ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরও সে সময়ে এত বেশী ডাক হইতে লাগিল যে তাঁহারও বাড়ীতে দেখা পাওয়া ভার সুতরাং এ ভ্রমের নিরসন তাঁহার দ্বারাও ঘটিয়া উঠিল না। ভুলই হউক আর ঠিকই হউক রামপ্রসন্ন যতটুকু বুঝিতেন ডাক্তারের আদেশ পালন করিতে ত্রুটি করিতেন না বরং ঔষধ পথ্য ঠিক সময়ে খাওয়া হইলে তাঁহার মনে যেন বিশেষ শান্তি বোধ হইত। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপদেশগুলি রক্ষা করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ হইত না। নিজের শারীরিক ক্রিয়া ও বেদনার তারতম্য লক্ষ্য করা ক্রমশঃ তাঁহার এক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শারীর তথ্যের আলোচনায়

তাঁহার এখন বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত। কাহারও মুখে নিজ ব্যাধির সাদৃশ্যযুক্ত কোনও রোগের কথা শুনিলে মিত্রজা তাহা সাগ্রহে শ্রবণ করিতেন, রোগ লক্ষণাদির কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে জিজ্ঞাসা করিতেন এবং মানসিক উদ্বেগ যথাসাধ্য গোপন করিয়া নিজ অবস্থার সহিত স্থির ভাবে মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেন। ঔষধ ব্যবহার চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু বেদনা কিছুতেই কমিল না। রামপ্রসন্ন নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে তিনি ক্রমশঃই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন। কোনও কারণে হঠাৎ চিত্তবিপ্লব উপস্থিত না হইলে এই মানসিক প্রবোধেরই আত্মপ্রবঞ্চনা করা চলিত, কিন্তু যে দিন স্ত্রীর সহিত কলহ সরকারী কার্য্যে অসাফল্য বা তাসের বাজিতে পরাজয় নিবন্ধন হঠাৎ মনটা খারাপ হইয়া যাইত সে দিন আর দুরারোগ্য রোগের পূর্ণ প্রভাব অনুভব করিতে বিলম্ব হইত না। পূর্ব্বে এ সকল সামান্য ব্যাপারে তাঁহার কোন বৈলক্ষণ্যই দেখা যাইত না,—'গৃহের অশান্তি সহজেই পরিহার করা চলিবে, সরকারী কার্য্যে যথাকালে, নিশ্চয়ই যশোলাভ ঘটিবে এবং পরের দিন তাস খেলায় কখনই হার হওয়া সম্ভব নহে' এবম্বিধ স্বোদ্ভাবিত আশ্বাস বাক্যে তিনি তাঁহার ক্ষণিক চিত্তবৈকল্য সহজেই দূরীভূত করিয়া ফেলিতেন। এখন এই সব কারণেই তাঁহার ঘোর অবসাদ ও গভীর নৈরাশ্য ঘটিতে লাগিল। এখন আর এরূপ অবস্থায় তিনি মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিতেন না, ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতেন—"এম্নি করিয়া পাঁচজন মিলিয়াই আমার

সর্ব্বনাশটা করিল, সবে ঔষধটা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে ঠিক সেই সময়েই যত রকম উৎপাত—এতে কি কখনও রোগ সারিতে পারে।"

মিত্রজা মধ্যে মধ্যে বুঝিতে পারিতেন যে, যখন তখন হঠাৎ এরূপ রাগান্বিত হইলে ব্যারাম তো বৃদ্ধি পাইবেই এমন কি তাহাতে জীবন হানিরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বুঝিয়াও তিনি কোন ক্রমেই আত্ম-সংবরণ করিতে পারিতেন না।

অপ্রিয় প্রসঙ্গে মনোযোগ না দিয়া সেগুলি নীরবে উপেক্ষা করিলে মন ও শরীর উভয়ই সুস্থ থাকে; কিন্তু "বিপৎ কালে বিপরীত বুদ্ধি" তাই জ্ঞানবান্ রামপ্রসন্নকেও প্রায়শঃ উল্টা পন্থাই অবলম্বন করিতে দেখা যাইত—কেহ অনুযোগ করিলে মিত্র মহাশয় বলিতেন—"সকল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিলে কি কখনও সংসারী লোকের মন স্থির থাকে?" ফলে সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে গিয়া অল্পমাত্র অসুবিধা বোধেই তাঁহার ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিত। ইহার উপর নিত্য নূতন ডাক্তার দেখান এবং রোগের অবস্থা স্বয়ং বুঝিবার চেষ্টায় ক্রমাগত ডাক্তারী পুস্তক পাঠের ফলে ব্যারামটিও ক্রমশঃই জটিলতর হইয়া পড়িতেছিল। অবশ্য একদিনেই রোগের কিছু বিশেষ একটা হ্রাসবৃদ্ধি বুঝা যায় না, কিন্তু পরিবর্ত্তন যেখানে অল্প রোগী যদি সেখানে চিকিৎসকের ন্যায় রোগের অবস্থা বুঝিতে যায় তাহা হইলে ভুল হইবারই অধিক সম্ভাবনা। মধ্যে মধ্যে নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থা লওয়ার জন্য এক একবার এক এক জন নূতন ডাক্তারের কাছে

গেলে রোগের গতিও ক্রমশঃ দ্রুততর বলিয়াই বোধ হইতে থাকে।

রামপ্রসন্নের কিন্তু কি অভ্যাস হইয়াছিল কোথাও কিছু নূতন ভরসা না পাইলেও তিনি ডাক্তারদিগের বাড়ী বাড়ী হাঁটিতে ছাড়িতেন না। সেই এক মাসের মধ্যেই অপর আর একজন বিলাত ফেরত বিশেষজ্ঞকে দেখাইতে গিয়া তাঁহার মন আরও খারাপ হইয়া গেল। প্রথমবারের বড় ডাক্তারটি যাহা বলিয়াছিলেন ইনিও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন, তবে তফাতের মধ্যে এই যে ইহার প্রশ্নগুলি কিছু পৃথক্ ধরণের। দুইজন প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসকের রায় মিলিয়া যাওয়ায় রামপ্রসন্নের মৃত্যুভয় ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রাজধানীর অপর একজন সুবিখ্যাত ডাক্তার রামপ্রসন্নের কোনও বাল্য-বন্ধুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। রামপ্রসন্ন ভাবিয়া চিন্তিয়া এক রবিবার দেখিয়া তাঁহার নিকট যাওয়াই স্থির করিলেন। এ ডাক্তারটির রোগের নিদান কিছু আলাহিদা রকমের। তিনি আরোগ্য লাভ সম্বন্ধে আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রশ্নগুলির ইঙ্গিত আভাসে মিত্রজার দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়া গেল। শেষে লুকাইয়া লুকাইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও চলিতে লাগিল। হোমিওপ্যাথিক মতে সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে—পূর্ব্ব ডাক্তারগণের রোগনির্ণয় এস্থলেও সেইরূপ ভ্রান্ত বলিয়াই স্থিরীকৃত হইল। রামপ্রসন্ন অন্যান্য ঔষধাদির সহিত গোপনে এক সপ্তাহ কাল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিলেন,

কিন্তু উহাতে কোন ফলই হইল না—অবশেষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতিতে বিশ্বাস হারাইয়া মাতুলী ও দৈব-চিকিৎসার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। একজন কোনও প্রাচীন ভদ্রলোক জনৈক বৈষ্ণব-মোহান্তের এক শালগ্রাম-শিলার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ব্যাখ্যান করিতেছিলেন—বলিতেছিলেন, কোনও বিশেষ তিথিতে সেই শিলাধৌত জল পান করিলে অতি কঠিন ব্যাধিও আরোগ্য হইয়া থাকে। রামপ্রসন্নের মনে মনে একবার হিন্দু-দেবতার দৈব ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল—ভাবিতে লাগিলেন সামান্য একটু জলপান করিয়াই যদি ফল পাওয়া যায়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি? পরক্ষণেই চিত্তদুর্ব্বলতার জন্য তাঁহার নিজের উপর বড় বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল—ভাবিতে লাগিলেন, শেষে আমি হইতে বসিলাম কি? এ সবই তো মিথ্যা বুজরুকী দুই তিন পুরুষ ধরিয়া খৃষ্টান-ধর্ম্ম মানিয়া শেষ-কালে কি জ্ঞান-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া অন্ধ কুসংস্কারে আবদ্ধ হইব? এখন হইতে আর শুধু রোগের কথা ভাবিয়া হিতাহিত বোধ নষ্ট করিয়া ফেলিব না। বার বার এমন করিয়া আর মত পরিবর্ত্তন করিতেছি না। গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত এবার এক ডাক্তারেরই ঔষধ খাইব তাহাতে যদি কোনও উপকার না দেখি তখন বরং নূতন কোনও ব্যবস্থা করা যাইবে।" কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মুখে করা যত সহজ কাজের বেলা তত সহজ নহে।

মিত্রজার পেটের বেদনা ক্রমেই দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল যেন কোন ক্রমেই আর তাহার বিরাম নাই। মুখের বিস্বাদভাব ক্রমে

আরও বাড়িয়া উঠিতেছিল, আহার কমিয়া গেল। শরীরের দুর্ব্বলতা যেন দিন দিন বাড়িয়া চলিল আর সেই সঙ্গে মুখেও বিশ্রী দুর্গন্ধ অনুভূত হইতে লাগিল। দেহের ভিতর যে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা রামপ্রসন্ন ছাড়া আর কেহই বুঝিল না। আত্মীয়-স্বজন এসব লক্ষণ দেখিয়াও দেখিল না—মনে করিতে লাগিল তাঁহার শরীর পূর্ব্বেরই মত রহিয়াছে। নিতান্ত আপনার জনেরও এই প্রকার নিশ্চেষ্ট নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া তাঁহার এক এক সময়ে বড়ই দুঃখ হইত।

সেই সময়ে ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার পদ খালি হওয়ায় রামপ্রসন্ন চিকিৎসার সুবিধা হইবে বিবেচনায় অনেক চেষ্টা করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। এখানে আসিয়া অবধি স্ত্রী-কন্যা উভয়েই সামাজিক নিমন্ত্রণ, সান্ধ্য-সমিতি ও সঙ্গীতাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিত সুতরাং গৃহস্বামীর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করার আর তাহাদের অবসর ছিল না। হিমানী মধ্যে মধ্যে তাহার স্বামীর খুঁৎখুঁতেমি ও কোপনস্বভাবে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিত—যেন সবই তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ! রামপ্রসন্নও দেখিলেন তিনি ক্রমশঃই যেন স্ত্রী-পরিবারের চক্ষুশূল হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার অসুখ সম্বন্ধে তাঁহার স্ত্রীর যে ধারণা জন্মিয়াছিল হাজার তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও তাহার একচুল বদলাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার স্বামীর উপস্থিতি কালেও আত্মীয় বান্ধবগণের সমক্ষে মিত্র-গৃহিনীকে বলিতে শুনা যাইত "রোগ আর ভাল হ'বে কি? ঔষধ পথ্যের নিয়ম না মানলে কখনও ব্যারাম সারে? একে উনি মন

স্থির করে ভদ্রলোকের মত এক ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না তার উপর আবার ঘোর অনিয়ম। আজ হয় তো রীতিমত ঔষধ পথ্য খেয়ে ঠিক সময়ে সকাল সকাল শুতে গেল্লেন, কিন্তু কাল আবার লক্ষ্য না রাখ্‌লেই ঔষধ খেতে ভুলে যাবেন, হয় তো কুপথ্য আহার করে বস্‌বেন আর রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত জেগে বসে বসে তাস পিট্‌বেন এতে কি ভাল মানুষেরই শরীর টেঁকে?" শুনিয়া রামপ্রসন্ন একদিন চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তোমার আর বল্‌তে কি? নিয়ম অনিয়মের তুমি ভারি খোঁজ রাখ? কবে আমি কি অত্যাচার করেছি বল তো?"

হিমানী। কেন সেই সেদিন লীলাময় বাবুর বাড়ীতে অত রাত্রি পর্য্যন্ত তাসের আড্ডায় কে বসেছিল?

রামপ্রসন্ন। সেকি আর সাধে বসেছিলাম—তাস হাতে করে ভুলে থাকবার চেষ্টা না করলে রোগের যন্ত্রণাতেই যে আমাকে দুপুর রাত পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখ্‌তো।

হিমানী। তা যে যাই বলে বলুক ও রকম করে চল্‌লে কিন্তু রোগত' সারবেই না মাঝ থেকে আমাদেরও চিরকাল জ্বলে পুড়ে মর্‌তে হবে।

এতো একদিনের ঘটনা, কিন্তু এরূপ যে আরও মধ্যে মধ্যে না হইত তাহা নহে। স্বামী যে নিজ দোষেই রোগ ভোগ করিয়া তাহার অন্যান্য জ্বালা-যন্ত্রণার উপর আরও কয়েকটি অতিরিক্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছে একথা মিত্র-গৃহিণী সুবিধা পাইলে কোন দিনই সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

রামপ্রসন্ন বুঝিতেন তাঁহার পত্নী যাহা বলিতেছে তাহা তাহার ইচ্ছা প্রবুদ্ধ নহে, কিন্তু জানিয়াও তাঁহার বড় সান্ত্বনা বোধ হইত না।

রামপ্রসন্ন ক্রমশঃ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন যে আদালতেও লোকে যেন তাঁহার প্রতি কেমনতর নূতন ভাবে ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। কাহারও কাহারও কথার ভাবে মনে হইত তিনি যে শীঘ্রই কর্ম্মত্যাগ করিবেন একথা যেন সকলে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার তাঁহার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত শারীরিক অবস্থা লইয়া তামাসা করিতেও ছাড়িতেন না। যে কাল ব্যাধি তাঁহার সুঠাম-দেহে নিজ অধিকার স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পলে পলে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহারই দুঃসহ যন্ত্রণা লইয়া পরিহাস! হায় শিক্ষিত সমাজের দস্তুর সাহানুভূতি!

সহকর্ম্মিগণের মধ্যে যে সেন সাহেবের ভদ্রতা ও সদানন্দ প্রফুল্ল ভাব মিত্রজাকে নিজের দশবৎসর পূর্ব্বেকার জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিত তাঁহারই হাল্‌কা বিদ্রূপগুলি তাঁহার নিকট এখন সমধিক কষ্টকর বলিয়া মনে হইত। একদিন সন্ধ্যাকালে রামপ্রসন্নের কয়েকজন বন্ধু তাঁহার গৃহেই তাস খেলিতে আসিলেন। ঘটা করিয়া এক প্যাক নূতন তাস খোলা হইল। রামপ্রসন্নের হাতে আরও এক প্যাক তাস বণ্টন হইলে রামপ্রসন্ন হাঁকিলেন—No Tramps (নো ট্রাম্পস্)। যেরূপ সুবিধার হাত তাহাতে একখানি পিঠও ফাঁক যাইবার নহে। হঠাৎ মিত্রজার পেটের পার্শ্বে সূচী বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় ভীষণ যন্ত্রণা অনুভূত হইল—মুখটা অসম্ভব তিক্ত ও

বিস্বাদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! তীব্র বেদনায় অস্থির হইয়া রামপ্রসন্ন চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাসের জিৎ তখন নেহাইৎ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার 'খেলু' (partner) ভদ্রতা করিয়া 'পিঠ' গুলি তাঁহার দিকে আগাইয়া দিতেছিলেন—উদ্দেশ্য বাকী পিঠ কয়টি তিনিই গ্রহণ করেন। রামপ্রসন্ন উল্টা বুঝিলেন—ভাবিলেন "আমি কি রোগে এতই অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি যে 'পিঠ' কয়টাও সরাইয়া লইতে পারি না।" উত্তেজনায় তাঁহার ভুল হইয়া গেল! হাতের তাস গোলমাল করিয়া তিনি বাকি পিঠ সব কয়টি নিতান্ত নিষ্কর্ম্মার ন্যায় বিপক্ষ পক্ষের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ক্রীড়া-সঙ্গীটি খেলার ওরূপ আকস্মিক বিপর্য্যয়ে যে কিরূপ দুঃখিত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার নিজের কোনই কষ্ট হইতেছিল না —খেলার ফলাফলের উপর হঠাৎ এই অনাসক্তি তাঁহার কেমনতর অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছিল। রামপ্রসন্নের মুখ দেখিয়া সঙ্গিগণ সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে হঠাৎ তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে—তাই সকলেই তাঁহাকে সে রাত্রির মত খেলা বন্ধ রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসন্ন ক্লান্তি বা অসুস্থতার কথা কোনক্রমেই স্বীকার করিলেন না, জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমার শরীর ত ভালই আছে, আর মিছামিছি বিশ্রাম করিয়া সময় নষ্ট করিব কেন? বরং ততক্ষণ পাল্টা বাজীটা শেষ হইয়া যাইবে।" তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া খেলায় আর কাহারও উৎসাহ ছিল না। সকলেই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন

করিয়া গম্ভীরমুখে বসিয়া রহিলেন। ভাগ্যক্রমে সেই সময়েই আহারের ডাক পড়িল। তাসের টেবিল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সকলেই যেন স্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। আহারাদির পর বন্ধুগণ চলিয়া গেলেন। রামপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন—"নিজের জীবন তো বিষময় হইয়াছে, এখন দেখি পরের সুখেরও অন্তরায় হইতে চলিলাম। যে বিষে নিজের দেহমন জর্জ্জরিত তাহা কি অপরের জীবনেও সংক্রামিত করিতে থাকিব। হায়—দুর্ভাগ্য ইহার যে আর প্রতিষেধক ঔষধও নাই।" এইরূপ ভয়, দুশ্চিন্তা ও রোগযন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া রামপ্রসন্ন প্রায়ই দিনশেষে শয্যা-গ্রহণ করিতেন, কিন্তু রাত্রির অধিকক্ষণ ধরিয়াই চক্ষের পাতাটিও বুজিতে পারিতেন না। পরের দিন সকাল হইতে হইতেই শয্যা-ত্যাগ না করিলে নয়—রায় লিখিতে না হউক উপস্থিত আমলাবর্গের সহিত আফিসের কার্য্য সম্পর্কীয় নানাবিষয় আলোচনা করিতে হইবে, তাহার পর দশটার মধ্যে আহারাদি সারিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে আদালতে হাজির হওয়া চাই সুতরাং রাত্রে ঘুম হয় নাই বলিয়া সাড়ে আটটা নয়টা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়িয়া থাকিলে চলে কি করিয়া। যেদিন শরীর নিতান্ত অসুস্থ বোধ হওয়ায় মিত্রজা আফিস না যাইতে পারিতেন সেদিন আর তাঁহার কষ্টের পরিসীমা থাকিত না।

৫

ইহার পর আরও মাস ছয় কাটিয়া গিয়াছে। বড়দিনের ছুটীর আগের দিবস রামপ্রসন্নের শ্যালক পর্ব্বোপলক্ষে কলিকাতায়

বেড়াইতে আসিয়া তাঁহার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি-লেন। আফিস ফেরতা রামপ্রসন্ন বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ দেহ কুটুম্বটী মেজের উপর উবু হইয়া বসিয়া ব্যাগ হইতে কাপড় চোপড় বাহির করিতেছেন। পদশব্দ শুনিয়া ভগিনীপতির দিকে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইতেই তাহার চেহারার বিষম পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ভদ্রলোকের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। নীরব হতভম্বভাব তাঁহার মনের কথা স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া দিল। রামপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি হে আমার শরীর খুব খারাপ দেখিতেছ নাকি?" উত্তরে তাঁহাকে যেন একটু কিন্তুর সহিতই বলিতে হইল, "তা তেমন কিছু নয় বটে, তবে যেন বড় রোগা হয়ে পড়েছেন দেখ্‌ছি।"

অনেক শওয়াল জবাব করিয়াও বড় কুটুম্বের নিকট ইহার চেয়ে আর বেশী কথা আদায় না করিতে পারিয়া রামপ্রসন্ন নীরবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিতেই তাঁহার সম্বন্ধী বাটির ভিতর চলিয়া গেল। রামপ্রসন্ন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া নিভৃতে মুকুরে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে লাগিলেন। আয়নার সম্মুখে ও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কতবার কত রকম করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। অবশেষে দেরাজ খুলিয়া তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার এক সঙ্গে তোলা একখানি ফটোগ্রাফ বাহির করিলেন। আলোক-চিত্র-নিহিত নিজ প্রতিকৃতির সহিত মুকুর গাত্রস্থ প্রতিবিম্ব মিলাইয়া দেখিতেই রামপ্রসন্ন শিহরিয়া উঠিলেন—এই কয় দিনে কি ভয়ানক

পরিবর্ত্তন। জামার হাতা টানিয়া তুলিতেই দেখা গেল আবাহু নগ্ন হস্ত দুইখানি কি অসম্ভব শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামপ্রসন্নের মুখে দুর্ভাবনায় অন্ধকার আরো ঘনীভূত হইয়া আসিল। গদি আঁটা কৌচের উপর বসিয়া পড়িয়া তিনি নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ সব কিছুই নয়, শুধু মানসিক ব্যাধি একবার জোর করিয়া—"ন্যাই" বলিলেই —সকল আপদ্ চুকিয়া যাইবে।

রামপ্রসন্ন মন চাঙ্গা করিয়া তখন তখনই নথিপত্র খুলিয়া কাজে বসিয়া গেলেন, কিন্তু কিছুতেই আফিসের কাজ আর ভাল লাগিল না, অল্পক্ষণ পরে মনে হইল একবার বৈঠকখানায় যাই। দুয়ার ভেজান ছিল, কাছে যাইতেই শুনিতে পাইলেন ভাই ভগ্নীতে অনুচ্চকণ্ঠে কথাবার্ত্তা হইতেছে। তাঁহার স্ত্রী বলিতেছেন—"তোমার যেমন কথা। সব তাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়, এত ভয়ের কারণটা দেখ্‌লে কিসে।"

মিত্র-শ্যালক। ভয় আর কি মিছে হয়, মিত্র মহাশয়ের চেহারা দেখেই ত আমার চক্ষু স্থির, চোখের দিকেও কি একবার চেয়ে দেখনি, ঠিক যেন মরণাপন্ন লোকের যত জ্যোতিঃটুকু সব নিভে গিয়েছে। ব্যারামটা কি বল দেখি?

মিত্র-গৃহিণী। কি যে ব্যারাম তা কেউই তো ঠিক করে বল্‌তে পারে না। সহরের দুজন বড় বড় ডাক্তারকেই দেখান হয়েছে। সুরেন ডাক্তার বলেছিল কি একটা ব্যারামের নাম, কিন্তু রামধন ডাক্তার বলেছে—

রামপ্রসন্ন আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না, আফিস্ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া রোগের কথাই ভাবিতে লাগিলেন, কেবলই মনে হইতে লাগিল, রোগটি ত সহজ নয়—ভাসমান মূত্রাশয়; ডাক্তার বলিয়াছিল, মূত্রাশয়টা কোন প্রকারে স্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে। একবার মনে হইল, নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রাণপণে প্রয়োগ করিয়া দুষ্ট মূত্রাশয়টাকে স্বস্থানে ফিরাইয়া আনা যায় নাকি? শুনিতাম সেকালে সাধু সন্ন্যাসীরা ইচ্ছাশক্তির জোরেই কত কি অসাধ্য সাধন করিতেন। আজকাল ইংরাজী বইতেও ত এ সব কথার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। একবার দেখিই না কেন। চেষ্টা করাটা কি এতই কঠিন।

কিন্তু মনের এ ভাবটাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। একটু পরেই মনে হইল, না—একবার অনুকূলের কাছেই যাই।

অনুকূলবাবু তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু। ডাক্তার রামধন ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে।

রামপ্রসন্ন ঘণ্টা দিতেই আরদালী উপস্থিত হইল। বলিলেন—"আভি গাড়ী লানে বোলো।"

মিত্র-গৃহিণী স্বামী-সম্ভাষণে আসিতেছিলেন, গাড়ীর কথা শুনিয়া বলিলেন—"সেকি! এখনই আবার বাহিরে বার হ'বে নাকি? আফিসের কাপড়ও যে ছাড়া হ'ল না।"

পত্নীর হঠাৎ এরূপ স্নেহার্দ্র ভাব দেখিয়া রামপ্রসন্নের মন যেন আরও উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"অনুকূলের সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

চিকিৎসক-সখা প্রিয়বয়স্য অনুকূলবাবুকে সঙ্গে লইয়া রামপ্রসন্ন ডাক্তার-ভবনে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাড়ীতেই ছিলেন। অনুকূলবাবুর খাতিরে আজ তাঁহার সহিত রামপ্রসন্নের অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। ডাক্তারের মতে যাহা প্রকৃত নিদান রামপ্রসন্ন আনাটমি ও শারীরশাস্ত্র বিষয়ক সে সকল তথ্যগুলি ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইলেন। কৃমির ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট যে অন্ত্রাংশ তাহাতেই অতি ক্ষুদ্র কোনও কঠিন পদার্থ প্রবেশ করিয়াছে। ডাক্তার আশ্বাস দিলেন যে এ ব্যাধি দুরারোগ্য নহে। ঔষধ বা অস্ত্রপ্রয়োগ ফলে দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যাইবে, তাহার পর ঘা শুকাইলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ। সেদিন সন্ধ্যার সময় রামপ্রসন্নের বেশ ক্ষুধা বোধ হইল। বড় কুটুম্বের সহিত হাসি-খুসি গল্প-গুজব করিতে করিতে আহার সমাধা হইল, কিন্তু খাওয়ার পর আফিস ঘরে গিয়া রায় লেখাটা সাঙ্গ করিতে আর ইচ্ছা হইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে কোন রকমে জোর-জার করিয়া কাজে বসিলেন বটে, কিন্তু কেবলই মনে হইতে লাগিল কি যেন একটা বেশী প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যে মনসংযোগ করা হয় নাই, এখনও যেন কি একটা বাকি রহিয়া গিয়াছে। রায়টা লেখা শেষ হইয়া গেলে কিছুক্ষণ চিন্তার পর মনে পড়িল যে সেই বেশী প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যটি আর কিছুই নয় তাঁহার সেই রোগদুষ্ট অন্ত্রাংশ সম্বন্ধে একটা ঠিকঠাক মীমাংসা করিয়া ফেলা। রামপ্রসন্ন আরও কিছুক্ষণের জন্য এ চিন্তাটিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বৈঠকখানায় গিয়া চা-পানে ও অভ্যাগতদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় নিরত

রহিলেন। আজ তাঁহার ভাবী জামাতারূপে মনোনীত সেই নবীন ডেপুটিটিও আসিয়াছিলেন। রাত্রি একটু অধিক হইয়া পড়িলেও গান ও পিয়ানোর বাদ্য শুনিয়া এবং সামাজিক শিষ্টাচার ও কথা-বার্ত্তাদিতে নিমগ্ন থাকিয়া রামপ্রসন্ন যেন সুস্থব্যক্তির মতই আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও লক্ষ্য করিতেছিলেন যে অন্য দিন অপেক্ষা তাঁহার জীবন-পথের সঙ্গিটীর মন যেন আজ বেশ খুসী খুসীই বোধ হইতেছে। মিত্রজা কিন্তু নিজ ব্যাধির কথা বিস্মৃত হন নাই। আদালতের মোকর্দ্দমার ন্যায় এ চিন্তাটা মুলতবি রাখিয়াছিলেন মাত্র। কিছুক্ষণ পরেই মজ্‌লিস ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন। রামপ্রসন্ন উৎকণ্ঠিত চিত্তে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইবার আরোগ্য লাভের উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটা কিছু স্থির না করিলেই নয়। রামপ্রসন্ন অসুখের পর হইতে একটি ছোট ঘরে একাকী শয়ন করিতেন। এটি তাঁহার আফিস-কামরারই সংলগ্ন। রাত্রি-বাসের কাপড়খানি আলনা হইতে উঠাইয়া লইয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে মনে হইতে লাগিল ঘুম না আসা পর্য্যন্ত একটা কিছু না পড়িলে দুশ্চিন্তায় আরও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইবে। রাম-প্রসন্ন বাছিয়া বাছিয়া প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার একখানি পুস্তকের অনুবাদ লইয়া আসিলেন, কিন্তু পড়িতে গিয়া পুনরায় চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইলেন। কল্পনাবলে মনে করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে। দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া গিয়া ঘাও সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া আসিয়াছে।

যেন উদরদেশে আর বিন্দুমাত্র বেদনা নাই। রামপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন, "শুধু 'নাই' বা 'সারিয়া গিয়াছে' এরূপ বিশ্বাস মনের কোণে পোষণ করিলেই চলিবে না। সেই সঙ্গে শারীরিক ক্রিয়াদির সৌকর্য্য-সম্পাদনেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।" এই সময়ে ঔষধ সেবনের কথা স্মরণ হওয়ায় মিত্রজা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঔষধের শিশি হইতে এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া লইয়া—পানান্তে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া মনোযোগ সহকারে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির উপর ঔষধের ফলাফল লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য ঔষধপানের পর যন্ত্রণাদি কি পরিমাণে কমিয়া যায় তাহাই একবার বুঝিয়া দেখিবেন। রামপ্রসন্ন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু ঔষধটা নিয়ম করিয়া খাওয়াই আবশ্যক—আর যাহা কিছু অনিষ্টকর তাহার আর ত্রিসীমানা দিয়াও যাইব না। এই ত ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরটাও যেন একটু ঝর্‌ঝরে বলিয়া মনে হইতেছে। দেহের ভিতরকার দূষিত পদার্থের শোষণ-ক্রিয়াটা নিশ্চয়ই এতদিনে আরম্ভ হইয়াছে।"

এই কথা কয়টি ভাবিতে ভাবিতেই পুনরায় উদরাভ্যন্তরে সূচ ফুটানর ন্যায় অস্পষ্ট,—অতীক্ষ্ণ (dull) বিরামহীন যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। মুখেও হঠাৎ কিরূপ বিশ্রী বিস্বাদ হইয়া গেল। হৃৎপিণ্ড বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। রামপ্রসন্নের চিন্তাস্রোত অতর্কিতে প্রতিহত হইয়া—সমস্তই যেন উল্‌টা পাল্‌টা হইয়া গেল। হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে মিত্র সাহেব ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, "প্রভু! এ যন্ত্রণার

কি আর শেষ হইবে না? অকস্মাৎ শারীরিক অবস্থার একি ভয়াবহ পরিবর্ত্তন—তাহা হইলে এ সব কি শুধু অন্ত্রাংশ ও মূত্রাশয়ের প্রদাহ হইতেই জন্মিয়াছে? ব্যারামটিও ত বড় ছোট নয়—এ যে প্রাণ লইয়াই টানাটানি।” রামপ্রসন্নের বোধ হইতেছিল যেন পলে পলে জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হইতেছে। জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিলেও ত এ আর আটকাইয়া রাখার উপায় নাই। মিছামিছি আর নিজেকে ফাঁকি দিয়া লাভ কি? মৃত্যু যে ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহা বাটীর অপর কাহারও আর জানিতে বাকী নাই। আমিই কেবল এই আসন্নমৃত্যুর বার্ত্তা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কৈ এখনও ত মরিতে চলিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে না, আর কয়দিন কয় সপ্তাহই বা বাঁচিব —এখনই যে আয়ু শেষ হইবে না তাহাই বা কে জানে। এই ত জীবনপ্রদীপ দেখিতে দেখিতে নিভিতে চলিল, সংসারের আলো নিষ্প্রভ হইয়া চারিদিক যেন আঁধার হইয়া আসিতেছে। এই পর্য্যন্ত জ্ঞানে অজ্ঞানে যা হয় করিয়া কাটাইয়াছি, এইবার মহাপথের যাত্রী হইতে হইবে—কিন্তু যাইবই বা কোথায়—?”

রামপ্রসন্নের সর্ব্বশরীর যেন হিম হইয়া উঠিল—দেহ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নাসারন্ধ্র দিয়া নিশ্বাস যেন আর বহিতেছিল না, থাকিয়া থাকিয়া কেবল আবেগজনিত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটুকুই বক্ষমধ্যে অনুভূত হইতেছিল।

রামপ্রসন্ন মৃত্যুর পর আত্মার অবিনশ্বরতায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী না হইলেও এক্ষণে এ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিলেন।

"আচ্ছা মাটির দেহ তো মাটিতেই মিশিয়া গেল, কিন্তু মনের কি কোন পরিবর্ত্তন হইবে না? আগে যেমন 'আমি' ছিলাম তখনও কি সেইরূপই 'আমি' থাকিব? কিন্তু আত্মাই বল আর আমিত্বই বল সেই আমিটাই বা থাকিবে কোথায়? তবে এই মৃত্যুই কি চরম পথ?—না! এত সহজে জীবনটাকে যাইতে দিব না।" এই বলিয়া মিত্র মহাশয় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কোথায় বিচারকের ধৈর্য্য! কোথায় শিক্ষালব্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাস! হাঁতড়াইয়া হাঁতড়াইয়া আলো জ্বালিতে গিয়া বাতি বাতিদান সমস্তই মেজের উপর কাত হইয়া পড়িয়া গেল। রামপ্রসন্ন আর বসিতে পারিলেন না, এই টুকুতেই অবসন্ন হইয়া বিছানার উপর এলাইয়া পড়িলেন। অন্ধকারের মধ্যেই চক্ষুর্দ্বয় যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আর বাঁচিবার ইচ্ছা করিয়াই বা ফল কি? এখন আর চেষ্টা করা না করা দুইই সমান, এখন বাকী কেবল শুধু—মৃত্যু—মৃত্যু—মরণ। উহারা ত এ সবের কোন খোঁজই রাখে না—রাখিতেও চাহে না, আমার উপর উহাদের এতটুকুও মমতা নাই। বাহিরের লোকেরা সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মেয়েদের এখন পর্য্যন্তও পূরা দমে গান বাজনা চলিতেছে! বৈঠকখানা হইতে বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার এ অন্তিম শয্যাকেও রেয়াৎ করিতেছে না! আমি বাঁচি বা মরি তাহাতেই বা উহাদের আসিয়া গেল কি? কিন্তু উহারাই কি আর চিরদিন বাঁচিবে? না বাঁচুক, আপাততঃ ত প্রাণ ভরিয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া লইতেছে—ওঃ কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! বনের পশুরাও এদের চেয়ে অনেক ভাল।" রাগে

রামপ্রসন্নের দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছি আর অপরে আমোদ আহ্লাদ করিতেছে, এই অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য, এই মমতাশূন্য ব্যবহার তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত করিতেছিল। এ আচরণ তাঁহার কাছে কি ভয়ানক অসহ্য বলিয়াই যে বোধ হইতেছিল তাহা আর বলিবার নহে। আর থাকিতে না পারিয়া মিত্রজা পুনরায় বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"কি জানি কেন সমস্তই যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। না—এত উতলা হইলে চলিবে না, একবার প্রথম হইতেই সমস্তটা আগাগোড়া মনে করিয়া দেখি। তাই ত ব্যারামটার সূত্রপাত হইল কিসে? হাঁ এখন মনে পড়িতেছে বটে—" এই বলিয়া তিনি সকল ঘটনাগুলি আদ্যোপান্ত স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "মই হইতে পড়িয়া গিয়া পাশে লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ত তখন কোন ক্ষতিই হয় নাই, বেদনাটা ত সম্পূর্ণরূপেই সারিয়া গিয়াছিল। তাহার পর কি জানি কেন আবার নূতন করিয়া বেদনা আরম্ভ হইল। বাড়িতে লাগিল দেখিয়া ডাক্তারদের নিকট গেলাম, কোথায় একটু আশ্বাস পাইব তা নয় নিদান বিভ্রাটে ভয় ও নিরাশায় মন আরও দমিয়া গেল। তাহার পর কত রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম, কোথায় উপকার হইবে তা নয়, মন্দের দিকেই হু হু চলিতে লাগিল। ক্রমেই বল কমিয়া যাইতে লাগিল—যেটুকু সামর্থ্য ছিল এখন তাহাও রসাতলে গিয়াছে। দেহ তো শুকাইয়া শুকাইয়া অস্থি কয় খানিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—প্যাঁকাঠির বাণ্ডিল বলিলেও হয়।

চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, আর কাজ করিবারও শক্তি নাই। হিন্দুরা বলে যমরাজ মহিষে চড়িয়া আসেন, এদিকে মৃত্যু-বাহন মহিষের গলার ঘণ্টাধ্বনি যতই কাণের গোড়ায় আসিয়া বাজিতেছে আমি ততই উদরের অন্ত্রের সেই ক্রিমিবৎ অংশটুকুর কথাই ভাবিয়া সারা। কেবলই ভাবিতেছি কোন প্রকারে যদি এটাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া মেরামত করাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হয় তো এবারকার মত রক্ষা পাই। মৃত্যু যে নির্ম্মম ভাবে শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে সেদিকে একবারও লক্ষ্য করিতেছি না—তাহা হইলে কি প্রাণবায়ু এখনই বাহির হইয়া যাইবে?" মৃত্যুভয়ে রামপ্রসন্ন পুনরায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া বসিয়া আর একবার দেশালইএর বাক্সটা খুঁজিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিছানার ধারেই গোল টেবিলের মত একটা বড় টিপয় (teapoy) ছিল। সেটার উপরও অনেক সময় খবরের কাগজ, সোডা ওয়াটারের বোতল প্রভৃতির সহিত চুরট দেশলাইও থাকিত। টিপয়ের উপর অল্পক্ষণ ভর দিতেই কুনুইয়ে বেদনা বোধ হইতে লাগিল। রামপ্রসন্ন অজ্ঞান শিশুর ন্যায় ক্রোধান্ধ হইয়া সেই অংশটি আরও জোরে কুনুই দিয়া চাপিতে লাগিলেন—ফলে টিপয়টি সশব্দে উল্‌টাইয়া গেল।

রামপ্রসন্নের শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। মিত্রজা বালিসের উপর কাত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভাবিলেন তখনই তাঁহার মৃত্যু হইবে।

এদিকে মহিলাগণের সঙ্গীতচর্চ্চা শেষ হইলে কয়েকজন

প্রতিবেশিনী গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। মিত্র-গৃহিণী তাঁহা-দিগকে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিয়াছিল। টেবিল পড়ার শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হঠাৎ এ শব্দ হ'ল কিসের ?" রামপ্রসন্ন ঢাকিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"ও কিছু না, কি একটা পড়ে গেছে বুঝি।"

হিমানী পার্শ্বের ঘর হইতে বাতি লইয়া আসিল। দেখিল তাহার স্বামী নিতান্ত অসহায়ভাবে চাহিয়া আছেন, খুব খানিকটা দৌড়াইয়া আসিলে লোকে যেমন হাঁপায় রামপ্রসন্নও তখন পর্য্যন্ত ঠিক তেমনি ভাবে হাঁপাইতেছিলেন।

হিমানী। টিপয়টা পড়ে রয়েছে দেখ্‌ছি। কোথাও লাগে টাগে নি ত'?

রাম। না—হাত লেগে উল্টে গিয়েছে বোধ হয়।

মিত্রজা ভাবিলেন ইহার সহিত আর অধিক বাক্যব্যয় করিয়া কি হইবে ? বলিলেই বা বুঝিবে কি ?

বাস্তবিক হিমানী ভিতরের কথা কিছুই বুঝে নাই। সে তাড়াতাড়ি টিপয়টি খাড়া করিয়া বাতিদানে বাতি জ্বালাইয়া দিয়া গৃহ-গমনোন্মুখ অপর নিমন্ত্রিতাগণকে বিদায় সম্ভাষণের জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। পর্দ্দা পার্টির ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মেয়ে পুরুষের মজ্‌লিস স্বতন্ত্র হইয়াছিল।

সকলে চলিয়া গেলে মিত্রজায়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল স্বামী সেই এক ভাবেই চিৎ হইয়া পড়িয়া আছেন।

হিমানী। এখন কি আগেকার থেকে বেশী কষ্ট যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে ?

রামপ্রসন্ন। হাঁ।

হিমানী দ্বিধার ভাবে মাথা নাড়িয়া কাছের গোড়ায় একখানী কেদারা টানিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর একটু ভূমিকা করিয়া আরম্ভ করিল—"দেখ এমন ধারা করে ব্যারামটাকে তাচ্ছিল্য করলে চল্‌ছে না। আমি বলি ডাঃ চক্রবর্ত্তীকেই একবার খবর দেওয়া যাক" অর্থাৎ অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর খরচ খরচার দিকে না তাকাইয়া সহরের সব চেয়ে বড় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই এখন সদ্য প্রয়োজন। রামপ্রসন্নের ওষ্ঠে অবজ্ঞাসূচক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সহিতই বলিলেন—"না আমার জন্য আর হাঙ্গামের দরকার নাই।" হিমানী একটু বসিয়াই রামপ্রসন্নের কাছে উঠিয়া আসিল এবং বিলাতি-প্রথায় পতির ললাটদেশে চুম্বন করিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল। রামপ্রসন্ন বুঝিলেন পীড়িতের ওষ্ঠ-চুম্বনে পাছে কোনও সংক্রামক রোগের আশঙ্কা ঘটে সেইজন্যই এই পাশ্চাত্য ব্যবস্থা। ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর ভরিয়া গেল। চুম্বনকালে পত্নীকে একবার কাছ হইতে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু কোনও প্রকারে আত্ম-সংবরণ করিয়া লইলেন।

হিমানী যাইবার সময় বলিল—"ভগবান করেন যেন রাত্রিতে একটু সুনিদ্রা হয়।" রামপ্রসন্ন শুধু "হুঁ" বলিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

৬

রামপ্রসন্ন নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা যতই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন, নৈরাশ্যের ঘনঘটায় তাঁহার চিদাকাশ ততই আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। মৃত্যু সন্নিহিত জানিয়াও কেহই সহজে নিজ পরিণামে অভ্যস্ত হইতে পারে না। রামপ্রসন্নও তাই এ কথা কোন মতেই বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না।

'হরিচরণ মানুষ, মানুষমাত্রেই মরণশীল, অতএব হরিচরণকেও মরিতে হইবে।' কলেজে ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্র পাঠকালে রামপ্রসন্ন বিচারপদ্ধতির এই উদাহরণটী পাইয়াছিলেন।

এতকাল ধরিয়া যেন মনে মনে ধারণা ছিল যে এ কথাটা কেবল সেই হরিচরণের বেলাই প্রযোজ্য। কেশব তাঁহার ন্যায় জ্যান্ত মানুষ নহে, কেশব একটা উদাহরণ মাত্র সুতরাং তাহার মরণশীলতায় কাহার কি আসে যায়। তাহার সত্ত্বা অপর কোনও ব্যক্তির সত্ত্বা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুতরাং মানুষ জাতির সাধারণ উদাহরণস্বরূপ কোন এক অজ্ঞাত হরিচরণের সহিত তাঁহার আর সম্পর্ক কি? তাঁহার বাল্যকালে মা, বাপ, ভাই, বোন্ খেলার সামগ্রী কত কি ছিল। মা আদর করিয়া ভুলু বলিয়া ডাকিতেন। চাকর বাকর, সহিস কোচ্‌ম্যান সকলেই "ভুলুবাবু" বলিত। কত হাসি-খুসী আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়া তাহার বাল্যকাল কাটিয়া গিয়াছে। ছেলেবেলায় তাহার একটা পাঁচরঙ্গা রবারের বল ছিল। বলটা যখন নূতন কেনা হয় তাহার সেই গন্ধটা ভুলুর

বড়ই ভাল লাগিত। হরিচরণের সহিত এরূপ একটা ক্রীড়নকের কখনও কোনও সম্পর্ক ছিল কি? হরিচরণ কি কখনও মা কাছে আসিলে এত আহ্লাদ অনুভব করিত? সে কি কখনও তাহার ন্যায় মার কোলে বসিয়া মার গলা জড়াইয়া চুমা খাইয়াছে? কলেজে পড়িবার সময় হোষ্টেলে কোনও দিন খাবারের বেবন্দোবস্ত হইলে গলাবাজী করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার সময় বা তরুণবয়সে "প্রেমে" পড়িয়া হাবুডুবু খাইবার সময় এই হরিচরণের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কোথাকার কোন্ হরিচরণ কবে আদালতে বসিয়া দক্ষতার সহিত তাঁহার ন্যায় বিচার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে? কিছুই যার সঙ্গে মিল নাই আজ সেই হরিচরণের ন্যায় তাহাকেও মরণের বাধ্য হইতে হইবে এ কেমনতর সুবিচার? হঠাৎ এমন একটা অন্যায্য কথা ধারণা করিতেও যে প্রবৃত্তি হয় না।

আচ্ছা যে লোকটাকে মরিতে হইবে তাহার নিজের মনে আপনা হইতেই ত একটা এ সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মান উচিত নয় কি? রামপ্রসন্নের মনে হইতে লাগিল "অপর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের ন্যায় আমিও এ যাবৎ মরণের কথা বুঝিতে পারি নাই। কই এখনও তো সর্ব্বক্ষণ—মরিতে হইবে বলিয়া বোধ হয় না? কই—ভিতর হইতে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট রকম একটা প্রত্যাদেশ তো পাওয়া যায় নাই? এমন অতর্কিতে মৃত্যু আসে কেন? এমন একটা অনাসৃষ্টি কাণ্ড কি—না অনাসৃষ্টি বা বলি কি করিয়া? দেহের অবস্থা ও মনের অবস্থাই বা তবে এমন হইতেছে কেন? এ যে

কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না ?" মৃত্যুচিন্তা অবাস্তব কাল্পনিক ও দুশ্চিন্তা সঞ্জাত মধ্যে এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রামপ্রসন্ন ক্রমশঃ তাহা চিত্ত হইতে অপসারিত করিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অন্যদিকে মন দিয়া অন্য বিষয় চিন্তা করিয়াও তো কোন ফলই হইল না। জোয়ারের জলের আবর্জ্জনার ন্যায় এ দুর্ভাবনা যতই সরাইয়া ফেলিতে লাগিলেন মৃত্যুভয় ততই বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিকটে ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল। শুধু রোগের কথা লইয়া ব্যস্ত না থাকিয়া স্বেচ্ছামত যত বিভিন্ন বিষয়িণী আলোচনায় মন নিয়োগ করিলে দুশ্চিন্তা পরিহার করা যায় বটে, কিন্তু রামপ্রসন্নের বেলায় যেন সবই উল্টা হইয়া গেল ! পূর্ব্বে যে সকল চিন্তাপ্রবাহ অবসাদ কলুষিত মনকে সতেজ করিয়া মৃত্যুবিভীষিকা মনশ্চক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিত এখন আর সেগুলি কোন মতেই কার্য্যকারী হইল না। পূর্ব্বে সরকারী কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া চাকরীতে উন্নতি লাভই তাঁহার জীবনের একমাত্র কেন্দ্র ছিল, এখন হাজার চেষ্টা করিলেও রাজকার্য্যে সে পূর্ব্বানুরক্তি কোনক্রমেই ফিরিয়া আসিত না। পূর্ব্বের "সু" গুলি কি এক অভিশাপে যেন সমস্তই "কু" হইয়া গিয়াছিল। রামপ্রসন্ন স্থির করিলেন আবার একবার নিজ কর্ত্তব্যে মনঃসংযোগ করিয়া দেখিবেন। আগে যাহা জীবনের প্রধান চিন্তা ছিল তাহা কি এত সহজে ত্যাগ করা যায় ? "নাই বলিলে সাপের বিষও থাকে না।" মিত্র সাহেব এই পুরাতন প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সকল দুশ্চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া আদালতে গিয়া মহা আড়ম্বরে

মোকৰ্দ্দমা করিতে বসিয়া গেলেন। সেদিন ছোট আদালতে কি একটা মামলায় আইনঘটিত তর্ক লইয়া ফুলবেঞ্চ বসিয়াছিল। মিত্র মহাশয় অস্থায়ীভাবে চতুর্থ জজের কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহাকেও সেদিন বেঞ্চে বসিতে হইল। সহকর্ম্মিগণের সহিত কিছুক্ষণ আলোচনার পর রামপ্রসন্ন কাগজপত্র একপার্শ্বে সরাইয়া চেয়ারের হাতলের উপর বাহুদ্বয় রক্ষা করিয়া বিচারগৃহে সম্মিলিত জনগণের প্রতি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। চিন্তা-সখী অলক্ষ্যে কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন মিত্রজা তাহা জানিতেও পারেন নাই। পার্শ্ববর্ত্তী জজের সহিত নিম্নস্বরে দুই একটা জটিল বিষয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার পর—মোকৰ্দ্দমার সওয়াল জবাব আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবে মাত্র ঘাড় সোজা করিয়া মিত্র সাহেব যেই সম্মুখভাগে দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়াছেন আর অমনি রঙ্গশালার চিত্রপটের ন্যায় সমস্ত দৃশ্যখানি যেন কোথায় অকস্মাৎ অপসারিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ এইরূপ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিতেই পুনরায় উদরে বিষম যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল, কিসে যেন তাঁহার অন্ত্রাদি চৰ্ব্বণ করিতেছে। রামপ্রসন্ন মনোযোগের সহিত পাকস্থলীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতে করিতে মন হইতে এ সব চিন্তা রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর সহিত পূৰ্ব্বের ন্যায় মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইয়া গেল। ভয়ে রামপ্রসন্নের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। তাঁহার জ্যোতিহীন চক্ষুর্দ্বয় যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। রামপ্রসন্ন উন্মাদের ন্যায় আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, "এখানেও যে

যমরাজের দস্তুরমত আনাগোনা রহিয়াছে। তবে কি আদালতে বসিয়াও মৃত্যুভয় এড়াইবার উপায় নাই?”

এমন একজন সূক্ষ্মবুদ্ধি সুচতুর আইনজ্ঞ বিচারককে আদালতে বসিয়া আবল তাবল বকিতে শুনিয়া তাঁহার সহযোগী জজ মহাশয়গণ ও কেরাণী পেস্কারেরা সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। তিনি যে রোগ-যন্ত্রণায় মোকর্দ্দমার খেই হারাইয়া এইরূপ প্রলাপোক্তি করিতেছেন তাঁহার রোগক্লিষ্ট মুখমণ্ডল হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়া সকলেই বিশেষ দুঃখিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সেদিন মিত্রজা আর সাম্‌লাইয়া লইতে পারিলেন না। যেন তেন প্রকারে বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলেই মোকর্দ্দমার রায়ের জন্য অন্যদিন ধার্য্য করিয়া জজ বাহাদুরেরা বিচারগৃহ ত্যাগ করিলেন। রামপ্রসন্ন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় বিষণ্ণমনে নিজ গৃহে নীত হইলেন। বড় আশা ছিল যে চাকরী সংক্রান্ত কর্ত্তব্যে মগ্ন হইয়া থাকিলে মৃত্যুভয় হইতেও লুক্কায়িত থাকা যাইবে, কিন্তু সে আশাও ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে আবর্জ্জনা জড়াইয়া বসিলেও যে মৃত্যু-দূতে ছাড়িয়া কথা কহে না এ সত্যের উপলব্ধি মিত্রজা ভালরূপেই করিতেছিলেন। রোগযন্ত্রণা ভবযন্ত্রণা যাহাই বলুন না কেন ক্রমশঃ সবই সহ্য হইয়া আসে। মৃত্যুবিভীষিকায় এখন আর রামপ্রসন্নের ভয় হইত না। কিন্তু তাহাতেই বা সুবিধা কতটুকু? সর্ব্বক্ষণই মনে হইত যমদূতেরা ভয় দেখাইতেছে না বটে, কিন্তু নজরবন্দী করিয়া রাখিতে ছাড়ে নাই। এক একবার আসিয়া নিজেদের আনাগোনার সংবাদ জানাইয়া

যাইতেছে। বোধ হইত যেন কোন অশরীরী আত্মার পীড়াদায়ক অদৃশ্য দৃষ্টি সময় অসময়ে তাহার প্রতি নিবদ্ধ হইতে থাকে। অঙ্গুলিটি নড়াইয়াও এ যন্ত্রণা হইতে আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই। পঙ্গুর ন্যায় সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে হয়।

এই দৃষ্টি এড়াইয়া আত্মরক্ষণের জন্য রামপ্রসন্ন আপনাকে নানারূপ সুখস্বস্তি আরাম তোয়াজে ঘিরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম এ কৌশল কার্য্যকারী হইয়াছিল বটে, কিন্তু মৃত্যুর সম্মুখে সুখের প্রাচীর কতক্ষণ টিকিয়া থাকে? খানিকটা আপনা হইতেই ধসিয়া গেল, কোথাও বা স্বচ্ছ যবনিকার ভিতর দিয়া সানুচর মহাবৈদ্য আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। এত করিয়াও এই সকল ভীষণ দর্শন অতিথিকে দূরে ঠেকাইয়া রাখা চলিল না।

গত কয় সপ্তাহ হইতে মিত্রজা মধ্যে মধ্যে তাঁহার সখের সাজান সেই বৈঠকখানা ঘরে গিয়া বসিতেন। এই ঘরখানির সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধন করিতে গিয়া তাঁহাকে নিজ প্রাণ মূল্যস্বরূপ দিতে হইয়াছে। কি উচ্চ মূল্যে এই অকিঞ্চিৎকর সাধ মিটাইতে হইয়াছে তাহা মনে হইলে রামপ্রসন্নের মুখে বিষাদের করুণহাসি ক্ষণপ্রভার ন্যায় দেখা দিয়াই মিলাইয়া যাইত। ঘর সাজাইতে গিয়া সেই মই হইতে পড়িয়া যাওয়াই যে কাল হইল! তাহাই যে এ রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ!

একদিন রামপ্রসন্ন লক্ষ্য করিলেন সুন্দর পালিস করা সাধের টেবিলটিতে কিসের একটা দাগ পড়িয়াছে, এটা ওটা নাড়িতে

চাড়িতেই বুঝিতে পারিলেন যে একখানা ফটো আ-্বামের ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত কব্জা টানাটানিতে খুলিয়া গিয়াছে এ তাহারই আঁচড়। মনে পড়িল এই সুদৃশ্য আলবামখানি বেশ উচ্চ মূল্যেই ক্রয় করিতে হইয়াছিল। তারপর কত যত্ন করিয়া প্রিয়জনের আলেখ্যগুলি তাহাতে সাজাইয়া ছিলেন! আজ আলবামখানির দুর্দ্দশা দেখিয়া কন্যা ও তাহার সখীগণের উপর বড়ই রাগ হইল। তাহারাই ত যখন তখন এখানি লইয়া টানাটানি ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া থাকে, তাহারা অসাবধান না হইলে এমন মোটা পাতাগুলি মলিন হইত না, বইখানিও এরূপ ছিঁড়িয়া যাইত না। রামপ্রসন্ন স্বহস্তে পাতাগুলি জুড়িয়া ঠিকমত লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল আস্‌বাব শুদ্ধ টেবিলটিকে এ স্থান হইতে সরাইয়া ফেলিলে ইহা সহজে কাহারও চোখের উপর পড়িবে না, টানাটানিও বন্ধ হইয়া যাইবে। কোণে ব্রাকেটের উপর একটা ফুলদানি ছিল, সেই দিকেই মিত্রজা টেবিলখানি সরাইবার মনস্থ করিলেন। চাকরকে ডাকাডাকি করিতে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। তৈজসাদি ওলট্ পালট্ করিয়া টেবিলটি স্থানান্তরিত করণের প্রস্তাব তাহাদের আদৌ মনঃপূত হইল না। তাহারা রামপ্রসন্নের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইল। তর্ক ক্রমে কলহে পরিণত হইল। রামপ্রসন্ন বড়ই রাগিয়া গেলেন। ক্রোধবশে নিজেই টেবিলটা সরাইবেন স্থির করিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"না না তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না, সরাইতে চাও

এখনি চাকর ডাকিয়া সরাইতেছি, মিছামিছি জোর করিয়া হাঁচড়া হাঁচড়ি করিলে হয় তো আবার বেদনা বোধ হইবে।" রামপ্রসন্ন বেদনার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর উক্তিতে পার্শ্বদেশের সেই কুকুর কামড়ানর ন্যায় যন্ত্রণার কথা মনে পড়িল। তাই তো সে যন্ত্রণা যে পূর্ব্বের মতই সমান ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে! মৃত্যু-দূত কিছুক্ষণ গা ঢাকা দিয়াছিলেন, স্বচ্ছ-আবরণের ভিতর দিয়া পুনরায় তাঁহার আকৃতি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। মিত্র মহাশয় ভাবিলেন হয় তো একটু দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইয়া যাইবে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে ভরসাও আর রহিল না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সম্মুখের ফুলদানির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃতান্তকিঙ্কর যেন তাঁহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। আর মিছামিছি চিন্তা করিয়াই বা ফল কি? ইহার হাত যে কিছুতেই এড়ান যায় না। লোকে যুদ্ধে গিয়া যেমন জীবন হারায়, নিজ বাসগৃহে বৈঠকখানার পর্দ্দার পার্শ্বে সামান্য পদস্খলনের আঘাতেও কি তেমনিই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। রামপ্রসন্ন আপন মনেই তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। আমি কি সত্য সত্যই প্রাণ হারাইতে বসি নাই? অবশেষে মৃত্যু? কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! না, এ অনুমান সত্য নহে, ইহাতে প্রত্যয় করিতে পারি না, এও কি সম্ভব হয়! শুনিলে যে লোকে হাসিতে থাকিবে।—সম্ভব নয়! তবে এ যন্ত্রণা, এ বিভীষিকা হয় কোথা হইতে? মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জো কি?

মিত্র মহাশয় একাকী নিজ শয়নঘরে যাইয়া শয্যা গ্রহণ

করিলেন। এবার তাঁহার মরণের সহিত নির্জ্জনে বিশ্রম্ভালাপ! অনিচ্ছাসত্ত্বেও টু শব্দটী করিবার জো নাই। উপায়ের মধ্যে কেবল এক একবার সেই ভীষণ আকৃতির প্রতি কটাক্ষপাত ও সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠা!

৭

ইহার পর আর ৩ মাস রামপ্রসন্নের ব্যাধি এত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল যে সহসা তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। এ রোগের কবল হইতে তাঁহার যে আর উদ্ধার নাই রামপ্রসন্ন তাহা নিজেও জানিতেন এবং ডাক্তার পরিচারক হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পুত্র কন্যা স্ত্রী পরিজন কাহারও উহা অবিদিত ছিল না। গৃহে তাঁহার স্থান কবে যে শূন্য হইবে, কবে যে তিনি চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বয়ং রোগ-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবেন এবং অপর সকলকেও নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দিবেন, অপ্রকাশ্যে এই প্রশ্নের সমাধানই সকলের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। এখন রামপ্রসন্নের আর ভালরূপ ঘুম হইত না। প্রায় প্রতিদিনই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিত! ডাক্তার গায়ে সূচ ফুটাইয়া মর্ফিয়া পিচকারী করিয়া দিতেন, কিন্তু তাহাতেও বড় উপকার দর্শিত না। প্রথম প্রথম ঔষধের মাদকতা গুণে কেমন যেন এক প্রকার ঝিমানী আসিত, শরীর যেন অসাড় হইয়া পড়িত, তখন তখন বেদনারও যেন একটু উপশম বোধ হইত, কিন্তু নিত্য ব্যবহার ফলে ঔষধের শক্তি কমিয়া আসিতে লাগিল,

যন্ত্রণা কমিবে কি বরং সময়ে সময়ে পূর্ব্বের চেয়ে আরও অসহ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। চিকিৎসকের উপদেশ মত নিত্য নূতনতর পথ্যের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও রামপ্রসন্নের মুখে কিছুই ভাল লাগিত না—খাদ্যদ্রব্য মুখে দিলেই বিস্বাদ বলিয়া বোধ হইত। সহজেই বমনোদ্রেক ঘটিত।

শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াদিও এখন আর আপনা আপনি হইতে চাহিত না। সেগুলি সহজভাবে সুসম্পন্ন করাইবার জন্য অনেক কল কৌশল তোড় জোড়ের আবশ্যক হইত। ইহাতে রামপ্রসন্নের যে কি কষ্ট হইত তাহা আর বলিবার নহে। একে স্বাভাবিক স্বাধীনতার ব্যত্যয়—তাহার উপর আবার অনেক সময় শয্যাদি কলুষিত হওয়ায় সর্ব্বদাই কেমন যেন একটা দুর্গন্ধজনিত গ্লানির ভাব। সর্ব্বাপেক্ষা সাহায্য ব্যতিরেকে কোন আবশ্যকীয় কার্য্য করিবার অক্ষমতাই এখন তাঁহার মর্ম্মন্তুদ বেদনার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। দুস্তর মরুর মধ্যে একমাত্র শান্তির প্রস্রবণ ছিল তাঁহার বয়স্ক ভৃত্য হারাধন। সেই তাঁহাকে এই সকল ব্যাপারে সাহায্য করিত এবং দুইবেলা ঘর হইতে মল মূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া লইত। শিশুর ন্যায় অসহায় এই রোগাতুর বিচারকটিকে বোঝাইয়া পুছাইয়া রাখিবার ভার সে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছিল। হারাধন—পল্লীগ্রামের কৃষক-সন্তান। সহরে চাকরী করিতে আসিয়া মনিব-বাড়ীর পুষ্টিকর খাদ্যে তাহার দেহের শক্তি ও অঙ্গের লাবণ্য শনৈঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। হারাধন ফিটফাট বাবু গোছের চাকর ছিল না বটে, কিন্তু নিজের

সামান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে সে বড়ই ভাল বাসিত। সর্ব্বদা স্মিতমুখে আদেশ পালন করিয়া সে সহজেই, মনিবের স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সুস্থ দেহ সুকুমার ভৃত্যটিকে তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া যে নানারূপ অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইতেছে ইহাতে রামপ্রসন্ন মনে বড়ই অশান্তি অনুভব করিতেন।

একদিন কষ্টে স্বষ্টে শয্যা হইতে উঠিয়া স্বহস্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া মিত্রজা দেখিলেন যে ধুতিখানি ভালরূপ কোমরে জড়াইয়া লয়েন সে সামর্থ্যও আর তাঁহার নাই। মিত্র মহাশয় শ্রান্তিভরে একখানি গদি মোড়া আরাম কেদারার উপর এলাইয়া পড়িয়া বিশুষ্ক অর্দ্ধনগ্ন নিজ জানুদ্বয়ের প্রতি হতাশভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সেই মুহূর্ত্তে হারাধন দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে শীতের এক হাল্‌কা ঠাণ্ডা হাওয়া রোগীর বদ্ধ ঘরে প্রবেশ করিয়া যেন একটু বাহিরের সজীবতা আনিয়া দিল। হারাধনের পরিধানে একখানি মোটা ধুতি, তাহাও হাঁটুর নীচে অধিক দূর নামিয়া আসে নাই। ঘাড়ে একখানি ঝাড়নের ন্যায় মোটা গামছা ফেলা। তাহার সবল বাহুদ্বয়ে মাংসপেশীসমূহের সংস্থিতি গেঞ্জির উপর হইতেই বেশ স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল। হারাধন ঘর হইতে ময়লা প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য কলাই করা একটী বাল্‌তি হাতে করিয়া অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছিল, পাছে তাহার পদশব্দে রোগাতুর প্রভুর ঘুমটুকু ভাঙ্গিয়া যায়। রামপ্রসন্ন কিন্তু ঘুমাইয়া

পড়েন নাই। জাগিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি তাহাকে আসিতে দেখিয়া একবার ক্ষীণকণ্ঠে অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন —"হারাধন!" মনিবের অপ্রত্যাশিত আহ্বানে বালকভৃত্য চমকিয়া উঠিল; তাহার মনে ভয় হইল বুঝি বা সেবার কোনরূপ ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া অন্ত তিরস্কার খাইতে হয়। সে তাহার সন্ত প্রস্ফুটিত কুসুম কোরকের ন্যায় স্বাস্থ্য লাবণ্যমণ্ডিত নির্ম্মল মুখখানি সসঙ্কোচে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আজ্ঞে আমায় কি ডাক্‌ছেন?"

"আমি বল্‌ছিলাম বাবা, আমার জন্য তোমার কত ভোগই না ভুগতে হয়, তা তুমি কিছু মনে করো না, আমি ইচ্ছে করে তোমাকে কষ্ট দিই নে।"

হারাধনের চক্ষুর্দ্বয় স্বাভাবিক সাহানুভূতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার ঈষদ্ধাস্য স্ফুরিত অধরপ্রান্তে শুভ্র দৃঢ়-সন্নদ্ধ উজ্জ্বল দন্তপাতি মুহূর্ত্তেক নয়নপথে আবির্ভূত হইয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল। সে সশ্রদ্ধ বিনয়ের সহিত উত্তর করিল,—"সে কি কর্ত্তাবাবু আপনার শরীর অসুখ, এখন সেবা কর্‌ব না ত কর্‌ব কখন্?" হারাধন ক্ষিপ্রহস্তে আপনার কাজ সারিয়া লইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচের মধ্যে পিকদানী প্রভৃতি ধুইয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিল তিনি সেই একই ভাবে চেয়ার ঠেস দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজসগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেই রামপ্রসন্ন তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"হারাধন উঠিয়া বসিব যে সে সামর্থ্যও

আর নাই। রামধনিয়াটাকেও আজ দেখিতে পাইতেছি না। তুমি আমাকে একটু তুলিয়া ধর ত বাবা।"

হারাধন প্রভুর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া তাহাকে ধীরে চেয়ার হইতে উঠাইয়া অসংযত বস্ত্রাদি যত্নপূর্ব্বক পরিধান করাইয়া দিল। রামপ্রসন্নের আর আরামকেদারা ভাল লাগিতেছিল না, তাই তাহার নির্দ্দেশমত হারাধন একরূপ কোলে করিয়াই তাঁহাকে একটা সোফায় লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিল।

রামপ্রসন্ন বলিলেন—"বেঁচে থাক বাবা, এখন বরং একটু আরাম বোধ হচ্ছে। তুমি যেমন এ কাজগুলি সহজে করিতে পার, রামধনিয়ার দ্বারা তেমন হয় না।"

হারাধন মনিবের প্রশংসাবাদ শুনিয়া স্মিতমুখে কার্য্যান্তরে যাইতেছিল, কিন্তু মিত্রজার নিঃসঙ্গ অবস্থা আর ভাল লাগিল না। হারাধনের উপস্থিতি তখন তাঁহার নিকট বড়ই শান্তিপ্রদ বলিয়াই মনে হইতেছিল। রামপ্রসন্ন বলিলেন—"হারাধন শোনো, একবার ওই বামদিকের চেয়ারটা এধারে সরাইয়া ওর উপর আমার পা দুইখান তুলিয়া দাও তো। পা দুইটা উঁচুতে উঠান থাকিলে যেন একটু স্বস্তি বোধ করি।" হারাধন চেয়ারখানি আনিয়া পায়ের নীচে রাখিয়া দিল। সে যখন পা দুখানি তুলিয়া ধরিয়া চেয়ারের উপর বিন্যস্ত করিতেছিল, তখন রোগীর মনে হইতেছিল যেন যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইয়াছে।

মিত্রজা বলিলেন—"পা'টা আরও একটু উঁচুতে রাখলে ভাল হয়। চেয়ারের উপর না হয় একটা বালিস দিয়ে দাও।"

হারাধন একটা বালিস আনিয়া পায়ের তলায় রাখিয়া দিল। বালিস রাখিবার পূর্ব্বে ভৃত্যটি যতক্ষণ পদদ্বয় তুলিয়া ধরিয়াছিল ততক্ষণ রামপ্রসন্ন যেন একটু বিশেষ আরাম অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু বালিসের উপর পা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ক্ষণিক ক্লেশ-রাহিত্য, বেদনার সে সুদুর্লভ শান্তি কোথায় তিরোহিত হইয়া গেল। হারাধনকে ছাড়িয়া দিতে রামপ্রসন্নের আর মোটেই ইচ্ছা হইল না। রামপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—"হারাধন আজ তোমার বৈকালে কি কিছু বেশী কাজ আছে?" হারাধন সহরে আসিয়া সভ্যতা শিখিয়াছিল—তাই নম্রভাবে বলিল—"কাজ আর বেশী কি থাক্‌বে, কি করতে হবে বলুন।" "কি কাজ আছে শুনি।"

"গিন্নিমা হুকুম করেছেন যে কাল সকালে উনান ধরানর জন্য চার্‌টি কাঠ কেটে রাখতে হবে, তা সে কালকের কাজ কাল্‌কে করলেও চলবে, সদ্য সদ্য কর্‌তে হবে এমন কোনও তাড়া নাই।"

"তা হ'লে আমার পা দুটো আর একটু উঁচু করে ধর তো—পারবে তো? বিশেষ কোনও কষ্ট হবে না?" "আজ্ঞে না—এ আর এমন কঠিন কাজটা কি?" এই বলিয়া হারাধন পা দুখানি উঁচু করিয়া ধরিল। মিত্র মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল যে, যে মুহূর্ত্তে হারাধন পা দুখানি স্পর্শ করিয়াছে সেই মুহূর্ত্ত হইতে আর কোনও যন্ত্রণা নাই। রামপ্রসন্ন বলিলেন—"তাহা হইলে কাঠের ব্যবস্থা কি হইবে?"

"সে জন্য আপনি ভাবিবেন না—কাঠ কাটার যথেষ্ট সময় আছে।"

মিত্রজা ভৃত্যকে সম্মুখে বসিয়া পা দুখানি ধরিয়া থাকিতে বলিলেন এবং সে তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিলে তাহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। যতক্ষণ হারাধন কাছে বসিয়া রহিল ততক্ষণ রোগ-যন্ত্রণা আপনা হইতেই হ্রাস হইতেছে বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল।

ইহার পর হইতে রামপ্রসন্ন প্রায়ই হারাধনকে তাহার কাছে আসিতে বলিতেন। সেও অবসর পাইলেই শয্যাশায়ী গৃহস্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার পা দুখানি কখনও কাঁধের কখনও বা কোলের উপর রাখিয়া বসিয়া থাকিত। সেই সময় প্রভু ভৃত্যে নানারূপ সুখ দুঃখের কথা লইয়া আলোচনা চলিত। হারাধনের সরল ও মমত্বপূর্ণ ব্যবহার সত্য সত্যই রামপ্রসন্নের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। নিজের রোগযন্ত্রণার মধ্যে অপর সকলের স্বাস্থ্য সামর্থ্য খোস মেজাজ ও বাহাল তবিয়ৎ লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসন্নের বিরক্তি বোধ হইত বটে, কিন্তু হারাধনের স্ফূর্ত্তি ও দৈহিকশক্তি তাহার চিত্তে ঈর্ষাকলুষ স্পর্শ করিতে দিত না বরং মনে হইত বুঝি বা তাহার সংস্পর্শে নিজের নষ্ট স্বাস্থ্যও ফিরিয়া আইসে। তথাকথিত শিষ্টাচার রামপ্রসন্নকে চারিদিক হইতে একটা অসত্যের জালে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। জানিয়া শুনিয়াও সকলেই এ মিথ্যার প্রশ্রয় দিত বলিয়া রামপ্রসন্ন বড়ই মনোকষ্ট অনুভব করিতেন। তিনি যে বাঁচিবেন না এ কথা কেহই প্রাণান্তে স্বীকার করিতে চাহিত না। সকলেই তাঁহাকে শুনাইয়াই বলিত, স্থির হইয়া বিশ্রাম করিলে ও

ডাক্তারের আদেশাদি যথাযথ পালন করিলে ব্যাধি অচিরাৎ আরোগ্য হইয়া যাইবে।

যে নিজ মৃত্যুর আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার নিষ্ফলতা যাহার বুঝিতে বাকী নাই, ঔষধে রোগ ভোগ প্রবর্দ্ধিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন ফললাভের যে আর আশা রাখে না তাহাকে আবার এইরূপ ছেলেভুলান করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করা কেন? রামপ্রসন্ন ভাবিতেন তোমরাও বুঝিয়াছ আমিও বুঝিতেছি, তবে আবার প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া এ মিথ্যা অভিনয়ের আবশ্যকটা কি? প্রাণের আশা যে আর নাই এ কথা যখন সকলেই জানিয়াছে তখন আর মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া পাপের ভাগী হওয়া কেন? এই অনৃতের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী তাঁহার নিকট বড়ই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় বন্ধুবান্ধব সকলে আসিয়া মরণাহত ব্যক্তির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিবে—কোথায় তাহারা তাঁহাকে ভবের সুখদুঃখ চরণে দলিয়া মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিবে—আবশ্যক হইলে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাঁহার দুর্ব্বল মনে শক্তির সঞ্চার করিবে—তা নয় এ সব যেন শুধু সামাজিক ক্রিয়াকলাপে রঙ্গ দেখিতে আসা মাত্র। কেহ আসিয়া রোগীর ব্যবহৃত মশারিটার খুঁত ধরিতেছেন, কেহ বা বালিসের ওয়াড়ের খুঁৎ কাটিতেছেন, কেহ বা বড় জোর নূতন রকম রুচিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজের অক্ষুণ্ণ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কেহই সাহসী হইতেছেন না। এ কি কম দুঃখ? কম পরিতাপ! এই সব দেখিয়া রামপ্রসন্নের এক একবার বড় রাগ

হইত, মনে হইত একবার সকলকে বড় গলায় শুনাইয়া বলেন,— "বাছা সকল মিছা কথা বলিবার কি আর জায়গা পাও নাই? আমি যে আর দুদিন পরে শিঙ্গা ফুঁকিব। এখন একবার ভুলিয়াও সত্য কথা বলিলেও কি মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হইয়া যাইবে?"

কেহ মলিনবেশে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিলে শিষ্টাচারের ক্রটিতে উপস্থিত ভদ্রব্যক্তিগণের যেরূপ বিরক্তি বোধ হয় রামপ্রসন্নের দেহত্যাগের এই ভয়াবহ ক্লেশকর মন্থরতাও অনেকরই সেইরূপ একটা বিরক্তিজনক অসভ্যতা বলিয়া মনে হইতেছিল। রামপ্রসন্ন এ যাবৎ যে ভব্যতার উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন এ যেন তাহারই প্রতিশোধ! কাহারও আর দয়া মমতা দেখাইবার অবসর নাই, কেহই আর কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার অবস্থা বুঝিতে প্রস্তুত নহে। যা একটু সহানুভূতি তাহা ভৃত্য হারাধনের নিকট হইতেই মিলে। সেই যা একটু তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারে। সেইজন্য আর সকলের চেয়ে হারাধন কাছে থাকিলেই তাঁহার মন বরং ভাল থাকিত। হারাধন এই কয় দিন প্রায়ই অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত রামপ্রসন্নের পায়ে হাত দিয়া বসিয়া থাকিত কখনও বা পদদ্বয় কোলে তুলিয়া লইত। মিত্রজা সে সময় শরীর বড়ই হাল্‌কা বোধ করিতেন, যন্ত্রণারও যেন ক্রমশঃ অবসান হইতে থাকিত। নিজের স্বস্তিবোধ হইলেও রামপ্রসন্ন হারাধনের ক্লান্তির কথা ভাবিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। বার বার তাহাকে শুইতে যাইতে বলিতেন। হারাধনও ততবারই

মাথা নাড়িয়া বলিত—"কর্ত্তা আপনার শরীরটা এই তো একটু সুস্থ হয়ে আস্‌ছে মিছামিছি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! আমার ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হবে না।" প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ অনাবিল স্নেহ সিঞ্চনে ক্রমশঃই দৃঢ়ীভূত হইতেছিল।

হারাধন এক একবার পল্লীসুলভ অভ্যাসবশে, আপনার বদলে তুমি বলিয়াও ফেলিত—বলিত—"কর্ত্তাবাবু—তোমার ব্যারাম যদি এমন কঠিন না হত তাহলে এখুনি ঘুমুতে যেতাম। তা—তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ, তোমার কাছে বসে একটু সেবা কর্‌ব না? "সকলেই মিথ্যা স্তোকবাক্যে তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখার চেষ্টা করিত, কেবল হারাধন কখনও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিত না। লোক দেখান ভাবে রোগীর অবস্থা গোপন করিতে বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত দুর্ব্বল মনিবটির প্রতি নিজের আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন রাখিতে সে মোটেই ভালবাসিত না। একদিন হারাধনের কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্যত্র কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় সে রামপ্রসন্নকে প্রবোধ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিতেছিল—"কর্ত্তা, কেবল কাজের গতিকে মাঝে মাঝে আপনাকে ছেড়ে উঠে যেতে হয়। মরতে তো একদিন সকলকেই হবে, তা আমি কিন্তু আপনার সেবার কসুর হতে দেবো না।" আসন্নমৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া প্রভুর মনে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য হারাধনের মোটেই ছিল না, সে কেবল বলিতে চাহিতেছিল যে দুদিন বই আর বাঁচ্‌বে না তার সেবা করিতে কি কখনো কষ্ট হয়? আজ আমি যে তোমায় একটু যা'হক যত্নসত্ন করিতেছি, ভগবানের দয়ায় কেহ না কেহ আমারও

শেষ দিনে আবশ্যকমত খোঁজ খবর নিতে ভুল্‌বে না। আত্মীয় বন্ধুর মিথ্যা সান্ত্বনা ও কপট সহানুভূতির ভাণে রামপ্রসন্ন প্রায়ই রাগত হইয়া উঠিতেন। এক একবার মনে হইত এই দুঃখসঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে তাহাকে দয়া মায়া দেখাইবার মত বুঝি একটী প্রাণীও নাই। বড় ইচ্ছা হইত যে যন্ত্রণার সময় কেহ ছোট শিশুর মত তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া গায় হাত বুলাইয়া আদর যত্ন করিয়া তাঁহার রোগ শান্তির চেষ্টা করে। যৌবনদশায় পদার্পণ করিতেই যে মাতৃহারা এ বৃদ্ধ বয়সে জননীর স্নেহচুম্বন তাঁহার আর কেমন করিয়া মিলিবে। ছেলেবেলার ন্যায় আদরকুড়ান অর্দ্ধ-পক্ক শ্মশ্রু গম্ভীরমূর্ত্তি হোমরা চোমরা জজ সাহেবের পক্ষে যে মোটেই শোভা নহে—এ বয়সে এরূপ আব্‌দারের কথা শুনিলে লোকে যে তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে—রাম-প্রসন্নের ব্যাধিক্লিষ্টচিত্ত এ সব জানিয়াও এ অভাবজনিত দুঃখের বেগ কোনমতেই সম্বরণ করিতে পারিত না।

হারাধন মনিবের মনের অপরিস্ফুট ভাবটুকু বুঝিয়া লইয়া যথাসাধ্য তাহার ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিত বলিয়াই তাহার সংসর্গ রামপ্রসন্নের পক্ষে এরূপ সুখকর বলিয়া বোধ হইত।

কিন্তু সকলের মন ত এক ছাঁচে ঢালা নয়। কোন দিন হয় তো মিত্রজার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছে, মনে হইতেছে—একবার বালকের ন্যায় গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া লই এমন সময় হয় তো খবর আসিল তাঁহার সহযোগী রমণবাবু তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন। হাসিকান্না যাঁহার নিকট সমানভাবেই বর্জ্জনীয়, এরূপ ভাব হীন

শুষ্ককাষ্ঠবৎ ব্যক্তির কাছে স্নেহ আদরের আর মর্য্যাদা কোথায়? রামপ্রসন্ন রমণবাবু আসিতেছেন শুনিলেই তাড়াতাড়ি চোখের জল চাপিয়া ফেলিতেন। পরে তাঁহার প্রস্তরখোদিতবৎ ভ্রূকুটি-কুটিলমুখ দেখিয়া কেহই আর সে লুক্কায়িত দৌর্ব্বল্যের অস্তিত্ব অণুমাত্র জানিতে পারিত না। রমণবাবু আসিলেই রামপ্রসন্ন হয় তো সদ্য প্রকাশিত কোন হাইকোর্টের আপিলের রায় লইয়াই তর্ক জুড়িয়া দিতেন। নিজে মোকর্দ্দমাটি বিচার করিবার সময় যে মতটি অবলম্বন করিয়াছিলেন, হাইকোর্টের নজিরের বিরুদ্ধে সেই মতেরই স্বপক্ষে যথাবিহিত যুক্তি তর্ক ও সেই সঙ্গে শ্লেষপূর্ণ দু'চারিটি চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু পরে নিজের এই কপটতাটুকুর জন্য এইরূপ হীনভাবে অপরের নিকট আত্ম-গোপন করার জন্য তাঁহার বড়ই দুঃখ হইত। বস্তুতঃ তাঁহার শেষের কয়দিন সত্যমিথ্যার এই দ্বন্দ্ব লইয়া মোটেই শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই।

৮

অন্ধের দিবারাত্রির ন্যায় রামপ্রসন্নের কাছে দিনরাত্রির বড় ভেদ ছিল না। তবে হারাধন চলিয়া গেলে তাহার স্থানে রামধনিয়া আসিয়া তাহার গৃহমার্জ্জনার পর জানালার পরদা প্রভৃতি সরাইয়া জিনিষপত্র গোছগাছ করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতেই দিবাগমের লক্ষণ সূচিত হইত। অনুক্ষণ শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা বোধই যাঁহার সময়ের একমাত্র পরিচায়ক, মৃত্যুর নিদাঘ স্পর্শে যাঁহার ক্ষীণ জীবন

স্রোতস্বিনী সংসার সৈকতভূমিতে ক্রমশঃই ক্ষীণতরা হইয়া কেবল অন্তঃসলিলা হওয়ার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, তাঁহার আর দিবারাত্রির ছুটি বেছুটি, পরব বেপরব খোঁজের আবশ্যক কি!

যাঁহার কাল ঘনাইয়া আসিতেছে, ভীষণ ঘৃণাজনক মৃত্যুই যাঁহার একমাত্র পরিণাম, তাঁহার আর দিন, সপ্তাহ, ঘণ্টা গুণিয়া লাভ কোথায়? একদিন সকালে রামধনিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুর, চা নিয়া আস্‌ব কি?" রামপ্রসন্ন ভাবিলেন, রামধনিয়াকেও চায়ের মৌতাত ধরিয়াছে। বাড়ীর কেহ সময় মত চা খাওয়ার গাফিলতি করিবে তাহা আর তাহার বরদাস্ত হইতেছে না। রামপ্রসন্ন ভৃত্যের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"নারে বাপু, চা টা চাহি না, মিছামিছি জ্বালাতন করিস্ কেন!" তাড়া খাইয়া রামধনিয়া চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল—"হুজুর, একবার গদীমোড়া কোচখানার উপর এসে হাত পা ছড়াবেন কি?"

রামপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন, আমি যেন এখন এদের আপদ্ বালাই নোংরা আবর্জ্জনার মধ্যে! আমি থাকায় বেটার তাড়াতাড়ি ঘর পরিষ্কারের অসুবিধা হইতেছে, তাই কোচে শোওয়াইবার জন্য এত আগ্রহ। রামপ্রসন্ন পূর্ব্বের ন্যায় রুক্ষস্বরে মুখভার করিয়া বলিলেন—"না আমাকে আর তোর সরাতে নড়াতে হবে না।"

রামধনিয়া মনিবকে আর বিরক্ত না করিয়া আপন মনেই ঘর ঝাঁট দিয়া আস্‌বাবপত্র গোছগাছ করিতে লাগিল।

রামপ্রসন্ন তাহাকে একবার হাতছানি দিয়া ডাকিতেই সে নিকটে ছুটিয়া বলিল,—"আজ্ঞে কি বল্‌ছেন ?" "ঘড়িটা একবার দেতো।" ভৃত্য ঘড়ি আনিয়া দিল। রামপ্রসন্ন দেখিলেন, ৮টা বাজিয়া গিয়াছে।

রামধনিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে এত বেলা হয়ে গেলো কাকেও ত দেখ্‌ছি না ; এখনো কি বিছানা ছেড়ে ওরা ওঠেনি নাকি ?"

"আজ্ঞে খোকাবাবু সকাল সকাল্ উঠে পড়্‌তে গেছে। গিন্নি ঠাক্‌রুণ বলেছেন 'বাবু যদি খোঁজ করে তো আমায় ডেকে তুলিস্।' এখন একবার খবর দেব কি ?" "না আর ডাকা ডাকিতে কাজ নাই, বরং আমাকে একটু চা এনে দে।"

রামধনিয়া দুয়ারের কাছে যাইতেই রামপ্রসন্নের একলা পড়িয়া থাকিতে বড়ই ভয় বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলেন কোনও ছুতায় উহাকে আর একটু কাছে রাখি। হঠাৎ ঔষধের কথা মনে পড়িল। স্বগত বলিতে লাগিলেন—'বেটা ফিরে আসবে এখনও ঔষধটাও আর বড় খাওয়া হচ্ছে না। খেয়েই দেখি যদি একটু উপকার হয়!' রামধনিয়া বাহিরে যাইতে না যাইতেই মিত্র মহাশয় ডাকিলেন—"ওরে একবার ঔষধটা দিয়ে যা তো!"

ঔষধ আসিল। চামচে করিয়া একবার খাইতেই মুখে আবার সেই রকম বিশ্রী বিস্বাদ বোধ হইতে লাগিল। কোনও প্রকারে বমনোদ্রেক নিবারণ করিয়া রামপ্রসন্ন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—'ব্যাটাদের সব ফাঁকিবাজী, এতে আবার অসুখ সার্‌বে

না ছাই হবে! ঔষধে আর এতটুকুও বিশ্বাস নাই; আর এই বেদনা, সদা সর্ব্বদা এই উৎকট যন্ত্রণা এর কি আর ছাই নড়ন চড়ন আছে?' মিত্রজা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রামধনিয়া শুনিয়া কাছে আসিতেছিল, রামপ্রসন্ন অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"যা বাবা তুই চা আনৃতে যা।" রামধনিয়া বাহিরে গেলে মিত্রমহাশয় আরও সজোরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

যন্ত্রণা যে হঠাৎ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে, মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন উহা আরও দুঃসহ বলিয়া বোধ হইতেছিল। সর্ব্বক্ষণ সমান কষ্ট, এখন আর দিন রাত্রেও প্রভেদ বুঝিবার যো নাই! যদি সকাল সকাল একটা কিছু হেস্ত-নেস্ত হইয়া যায় তা হলেই বাঁচোয়া। তাই বা আর কি হইবে? হেস্ত-নেস্তর মধ্যে তো মৃত্যু—সেই অজ্ঞাত অন্ধকারের গর্ভে প্রবেশ—না না তাও কি হয়। এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও মিত্রজা এ সর্ত্তে রাজী হইতে প্রস্তুত নহেন।

রামধনিয়া চা লইয়া ফিরিয়া আসিলে মিত্রমহাশয় তাহার প্রতি শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন। সে যে কি প্রয়োজনে গিয়াছিল, কিসের জন্যই বা ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা যেন আর কিছুই মনে নাই। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া রামধনিয়ার ভয় হইয়া উঠিল। সে দুই একবার 'বাবু' 'বাবু' বলিয়া ডাকিতেই রামপ্রসন্ন একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"চা এনেছিস্, বেশ দাঁড়া, আমি একটু মুখটা ধুয়ে নিই; একটা ফর্সা গেঞ্জি দে ত।"

রামপ্রসন্ন মাঝে মাঝে এক একটু করিয়া জিরাইয়া লইয়া মুখ

হাত ধুইলেন। টুথব্রাস দিয়া দাঁত পরিষ্কার করিলেন, অবশেষে অতিকষ্টে আয়নার দিকে মুখ ফিরাইয়া চিরুণী দিয়া অযত্ন সংন্যস্ত চুলগুলি আঁচড়াইতে লাগিলেন। কেশসমূহ তাঁহার রক্তশূন্য ললাটের উপর পড়িয়াছিল। নিজের চেহারা দেখিয়া ভদ্রলোক নিজেই ভয় পাইতে লাগিলেন। চাকরে গায়ের জামা খুলিয়া লইয়া একটী ধোপদস্ত গেঞ্জি পরাইয়া দিল। পাছে দেহের অসম্ভব রুগ্নতা দৃষ্টে দুর্ভাবনায় মাথা ঘুরিয়া যায় এই ভয়ে রামপ্রসন্ন জামা বদলাইবার সময় দর্পণের দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে রামপ্রসন্নের প্রাতঃকৃত্য 'টয়লেট' শেষ হইল। ভৃত্য গায়ে একখানি শাল জড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে আরাম-কেদারায় বসাইয়া দিল। মিত্রজা চা পানে নিরত হইলেন। চা খাইতে খাইতে খানিকক্ষণ শরীর বেশ ভাল বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মুখের তিক্তস্বাদ ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বেদনাও অনুভূত হইতে লাগিল।

মিত্রজার আর আরাম করিয়া চা খাওয়া হইল না, অতিকষ্টে বাটীর চাটুকু গলাধঃকরণ করিয়া, আরাম-চেয়ারের পার্শ্বের হাতলে পা দু'খানি ছড়াইয়া রামধনিয়াকে যাইতে আদেশ করিলেন! আবার সেই ভাবনার অতল সমুদ্রে হাবুডুবু। শরীরের ত কিছুমাত্র উন্নতি নাই। যদি কদাচিৎ আশার ক্ষীণরেখা দূর হইতে দেখা দেয়, অমনি নিরাশার তিমিররাশি তখনি তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে। একলা ভাল লাগে না। কেহ কাছে থাকিলে মনটা সুস্থ থাকিবে বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু অপর কাহাকে নিকটে

দেখিলেও বিরক্তির অন্ত থাকে না, মানসিক চাঞ্চল্য আরও অসহ্য হইয়া উঠে। এই অবিরাম বেদনায়, নিরাশার এই নির্দ্দয় নিপীড়নের আর অবসান কোথায়? বরং তাহার চেয়ে ঔষধের সহিত একটু বেশী মাত্রায় মর্ফিয়া খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকাই ভাল। মৃতবৎ অসাড় শরীরে আর তেমন যন্ত্রণা বোধ হইবে না। না আর সহ্য হয় না, এইবার ডাক্তার আসিলেই কিছু একটা অজ্ঞান করার ঔষধ দিতে বলিতে হইবে। রামপ্রসন্ন ডাক্তারের বিষয় চিন্তা করিতে না করিতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আকার ইঙ্গিতে রোগীকে অযথা আশা ভরসা দেওয়া এ ক্ষেত্রে যে কতদূর অসঙ্গত ডাক্তার তাহা যে বুঝিতেন না তাহা নহে, কিন্তু করিবেন কি? এতকাল ধরিয়া আশ্বাস দিয়া আসিয়া এখন হঠাৎ অন্য মত করিলে চিকিৎসা শাস্ত্রের মর্য্যাদা থাকে কোথায়? ব্যারাম কিছুই নয়, দুই দিনে সারিয়া যাইবে, বারবার এই কথার পর হঠাৎ উহা দেবের অসাধ্য বলিয়া জানাইতে অন্ততঃ চক্ষু-লজ্জাও ত জন্মিয়া থাকে। অল্পক্ষণের জন্য কলিকাতায় আসিয়া মুরুব্বি প্রভৃতির সহিত দেখা করিতে গেলে মফঃস্বলের বড় চাকুরে বাবুদের যেরূপ প্রায় সারাদিনই জাব্বা জোব্বা টানিয়া বেড়াইতে হয়—অসুবিধা হইলেও নিস্তার নাই, এ অবস্থায় হঠাৎ "ভোল" বদলান সম্বন্ধে ডাক্তারেরও অনেকটা সেইরূপ ঘটিয়াছিল। ডাক্তারটি বড় শীত কাতুরে লোক, তখন পৌষমাস—শীতে তাঁহার হাত দুইটি বড়ই ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। ডাক্তার আসিয়াই দুই হাতের তালুতে তালুতে ঘর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ কি

শীতটাই পড়েছে মশায়, হাত দুটো যেন জমে যাবার উপক্রম হয়েছে।”

হঠাৎ ডাক্তারের হাত দুইটি একটু গরম হইয়া উঠিলেই রোগী যেন সঙ্গে সঙ্গে আধি-ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবেন।

ইহার পর প্রায় মিনিট দুই যাইতে না যাইতেই ডাক্তার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা আজ কেমন আছেন, বলুন তো? রাত্রে ঘুম টুম হচ্ছে কেমন?” ডাক্তারের মুখের ভাবে রামপ্রসন্নের মনে হইল ডাক্তার যেন রোগীর অবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কাজ কর্ম্ম কেমন চলিতেছে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন। প্রশ্নটি যেন আপনা হইতেই তাহার ঠোঁটের আগায় আসিতেছিল, আর একটু হইলেই উচ্চারিত হইত কেবল শেষ মুহূর্ত্তে ইহার অসঙ্গতি বুঝিতে পারিয়া কোনও প্রকারে চাপিয়া লইলেন। রামপ্রসন্ন ডাক্তারের দিকে নীরব তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। চোখের ভাষায় যেন স্পষ্টই বলিতেছিলেন—“বাপুরে তোদের কি আর প্রবঞ্চনার স্রোত থামিবে না?” ডাক্তার কিন্তু সে চাহনির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তাই মিত্রজাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল—“ডাক্তার বাবু যে যন্ত্রণা, ঘুম কি আর আছে—এ কষ্টের ত কিছুতেই কম্‌তি হয় না। আর যে বরদাস্ত করিতে পারি না। একটা কিছু যা হয় উপায় করুন—আর কোনও ওষুধ টষুধ কি নাই?”

“রোগী মানুষদের শুধু একই কথা, শরীর সারছে না—আগের মতই আছি। আরে মহাশয়, আগে মন ঠিক করুন,

তবে ত শরীর সার্‌বে—দেখি একবার হাতখানা। শীতে হাত দুটো আমার যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছলো, আসবামাত্রই আপনার গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা কর্‌তে গেলে আপনি চমকে উঠ্‌তেন" এই অল্প কথায় কৈফিয়ৎ দিয়া ডাক্তার বাজে বক্তৃতা রাখিয়া গম্ভীরমুখে রামপ্রসন্নকে রীতিমত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেহের উত্তাপ ও নাড়ীর গতি লক্ষ্য করা হইলে পর কখনও হাঁটু গাড়িয়া কখন ঝাঁকিয়া পড়িয়া কখনও বা পেটের উপরে নীচে নানাস্থানে টিপিয়া টাপিয়া কান লাগাইয়া জিম্‌নাষ্টিক কস্‌রতের ন্যায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে চিকিৎসক মহাশয় কিছুক্ষণ মিত্রজার ক্ষীণ দেহযষ্টি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে থাকিলেন। রামপ্রসন্ন জানিতেন এ সব শুধু বাহিরে লোক দেখান ফাঁকিবাজী মাত্র, তবে আদালতে কাজ করিতে করিতে কেমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, মিথ্যা আড়ম্বর আর তেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত না! কোর্টে মোকর্দ্দমার বক্তৃতায় উকিলবাবুরা কত সময় ঝুড়ি ঝুড়ি রচা কথা বলিয়া যাইতেন। এ প্রকার মিথ্যা উদ্ভাবনার উদ্দেশ্য রামপ্রসন্নের অবিদিত না থাকিলেও গম্ভীরমুখে স্থিরভাবে বসিয়া সকল কথাই শুনিতে হইত। এইরূপে বৃথা আস্ফালন ও বাগাড়ম্বর সহ্য করিতে তিনি ক্রমশঃ বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তাই এ ক্ষেত্রেও ডাক্তারের রোগ পরীক্ষার অভিনয়ে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না, বরং শেষের দিকে ব্যাপারটা ক্রমশঃ যে হৃদয়গ্রাহী হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার নিজের অজ্ঞাতসারে এই ভাবটাই

যেন কতক কতক প্রকাশ পাইতে লাগিল। ডাক্তার যখন পরীক্ষা সমাধার অব্যবহিত পূর্ব্বে পেটের পাশটা একবার ভাল করিয়া টিপিয়া দেখিতেছিলেন, সেই সময়ে বাহিরে মিত্র-পত্নীর রেশমী সাড়ীর খস্ খস্ শব্দ শুনা গেল।

তার পর দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া তিনি রামধনিয়াকে ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ না দেওয়ার জন্য তিরস্কার করিতেছেন, ইহাও মিত্রজার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় অতিক্রম করিতে পারিল না। হিমানী ঘরে প্রবেশ করিয়া একবার স্বামীর কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহার পর রামপ্রসন্ন এ বিষয়ে কোন উল্লেখ না করিলেও তাহার বিলম্বে শয্যাত্যাগের সাফাই গাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওমা কোন্ সকালে উঠে বসে আছি—কেবল মুখপোড়া চাকরটার জন্য নেবে আস্‌তে দেরী হল। ডাক্তারবাবু এতক্ষণ এসেছেন তাই কি একটা কোনও খবর দিয়েছে।" রামপ্রসন্ন একবার হিমানীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। অটুট স্বাস্থ্যে ও উছল লাবণ্যে ভরপুর সে সুঠাম দেহখানি রোগীর চোখে আর মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। পূর্ব্বে যে প্রিয়তমার গোলাপীগণ্ড, চিকণ কেশপাশ, সুগঠিত কোমল হস্তদ্বয় তাহার চিত্তকে এরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করিত, আজ তাহা দেখিয়া কেবল আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতেছিল। জীবনসঙ্গিনীর ঐ উদাসীন উপেক্ষায় চিত্ত ঘৃণায় ভরিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল তাহার স্পর্শ মাত্রেই রোগযন্ত্রণা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। হিমানীর ব্যবহারেও গৃহের এই রোগী ও তাহার দেহাশ্রিত রোগ সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্বভাবের

যে বিশেষ একটু পরিবর্ত্তন না বুঝিতে পারা যাইতেছিল তাহা নহে। স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এখন যেন কেবল রোগী চিকিৎসকের ন্যায় বাহিরের সম্বন্ধ। বেশ একটু পর পর ভাব। ডাক্তারেরা যেরূপ হাজার দর্শনী লইয়াও এই দূর দূর ভাবটা দূর করিতে পারেন না, মিত্র-গৃহিণী লোক দেখান যত্ন-খাতির বাহ্যাড়ম্বরে, কোন মতেই, ভিতরের এ আসল ব্যাপারটি চাপা রাখিতে পারিতেছিলেন না। প্রণয়-লীলার অপূর্ব্ব অভিনয়চ্ছলে, ব্যাধি আরোগ্য না হওয়ার সমস্ত দোষই রামপ্রসন্নের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপাইয়া, হিমানী অর্দ্ধ ক্রন্দনস্বরে অনুযোগ করিয়া বলিতেছিলেন—"বলুন ত ডাক্তারবাবু, এই ব্যারাম সার্‌বে কি করে? ওষুধ তা নিয়মমত খাবেন না, আপনারা যা মানা কর্‌বেন তা শুন্‌তে চাইবেন না! এই দুরন্ত শীতে গায়ে ঠাণ্ডা লাগাবেন, হারাণ চাকরের কাজই হচ্ছে লেপ-কম্বল ফেলে দিয়ে ওর খালি পা দুটো ঘাড়ে করে বসে থাকা। এতে ফলই বা হবে কি, শরীরই বা সার্‌বে কোত্থেকে?" মিত্র-পত্নীর অভিযোগ শুনিয়া ডাক্তার মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। হাসির অর্থ এই যে রোগী মানুষেরা ও রকম অবুঝ হইয়াই থাকে, তাহাদের উপর অত কড়াকড়ি করিতে গেলে চলে না। মিত্র মহাশয়ের দেহ পরীক্ষা হইলে ডাক্তার ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতে লাগিলেন। হিমানী এতক্ষণে সময় বুঝিয়া প্রকাশ করিল যে সে আপন বুদ্ধিতে সহরের বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়কে ডাকাইতে পাঠাইয়াছে, তিনি আসিয়া পারিবারিক চিকিৎসক মহাশয়ের

সহিত পরামর্শ করিয়া রোগীর চিকিৎসার ভালরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

রামপ্রসন্নের মুখে বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী ভঙ্গিমা সহকারে বলিলেন—"দেখ, এ যে শুধু তোমার মঙ্গলের জন্যই কর্‌ছি তা না, এ আমার নিজের প্রাণের দায়ে কর্ত্তে হয়েছে, এতে তুমি কিন্তু রাগ কর্ত্তে পাবে না।" মিত্রজা এ কথার আর ভালমন্দ কোনও জবাব দিলেন না। এই মিথ্যার বেড়াজাল কাটাইয়া বাহির হওয়া যে বড় কঠিন তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী ছিল না। কেবল উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, 'এ সকল প্রবঞ্চনাময় স্তোক বাক্যের কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা তাহা বুঝিয়া উঠি কি করিয়া?' রামপ্রসন্ন আর কি করিবেন তাঁহার স্ত্রী ত স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন যে তাঁহার জন্য যাহা কিছু করা হইতেছে সে কেবল তাহার নিজের স্বার্থেরই জন্য। এ শুধু স্বর্ণডিম্বপ্রসূ রাজহংসকে জীবিত রাখারই ব্যবস্থা মাত্র; কিন্তু বুদ্ধি করিয়া কথাটা এমনি ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে যে তাহার জবাব দেওয়াও কঠিন। তলাইয়া না বুঝিলে মনে হয়, যে কেবল প্রিয়হিতানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই সে অপর কাহারও পরামর্শের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ং এই সকল ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইয়াছে। সুবিখ্যাত ডাঃ ঘোষ বেলা ১১৷৷০টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার সেই টেপাটেপি কান লাগাইয়া শোনা আরম্ভ হইল। এবার দুই ডাক্তারে রোগীর মূত্রাশয় ও অন্ত্রাংশ লইয়া বড় রকম বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। রোগীর সম্মুখে তর্ক করিতে

করিতে যখন আর কুলাইয়া উঠিল না, তখন ধন্বন্তরীর শিষ্যদ্বয় পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া নবীন উৎসাহে নিদান সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক কথা মিত্রজার কান এড়াইয়া গেলেও এটা তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এ ক্ষেত্রে রোগীর জীবন-মৃত্যুর সমস্যা পূরণ লইয়া ডাক্তারদের বড় মাথা ব্যথা পড়িয়া যায় নাই। তাঁহারা কেবল অন্ত্রাংশ ও মূত্রাশয়ের রোগদুষ্ট অবস্থার কথা লইয়াই ব্যস্ত। শরীরে এই সকল যন্ত্রাদি একবার বিকল হইয়া গেলে এগুলিকে কেবল ঔষধাদির দ্বারা আট্‌কাইয়া কতদূর কার্য্যক্ষম রাখা যাইতে পারে ইহা লইয়াই গণ্ডগোল। রোগী বাঁচুক না বাঁচুক আসিয়া যায় না। একবার দৈহিক যন্ত্রের উপর ঔষধ বিশেষের ক্রিয়া বুঝিতে পারিলেই হইল, তাহা হইলেই ডাক্তার মহাশয় সন্তুষ্ট—তাহা হইলেই তাঁহাদের কাজ হাঁসিল।

বড় ডাক্তারটী চলিয়া যাইবার সময় জানাইয়া গেলেন—ব্যারামটি গুরুতর বটে, তবে হতাশ্বাস হইবার কোনও কারণ নাই। রামপ্রসন্ন আশা ও নিরাশার মধ্যে ঘন আন্দোলিত নিজ চিত্তকে সংযত করিয়া একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ডাক্তারবাবু তাহ'লে এখনও সেরে উঠবার আশা আছে কি?" দেশবিখ্যাত চিকিৎসক কূটতার্কিকের ন্যায় উত্তর করিলেন—"সে কি কথা মহাশয়, ভরসা নাই এ কি কখন বলা যায়! মানুষে পরমায়ু দিতে পারে না মানি, কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। রোগী নিশ্চয়ই সারিয়া উঠিবে, এ কথা কোন ডাক্তারই জোর

করিয়া বলিতে পারে না, তবে আপনার আরোগ্য লাভের যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।”

এই অনিশ্চিত আশ্বাসে রামপ্রসন্নের শীর্ণ মুখ এরূপ আনন্দের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল যে ডাক্তারের ভিজিটের টাকা দিতে আসিয়া হিমানী নির্ব্বাপিত প্রদীপের এই শেষ উজ্জ্বলতা টুকু লক্ষ্য করিয়া অতিকষ্টেও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

আশার যে ক্ষীণ শিখাটুকু দূর হইতে দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমেই আঁধারে মিলাইয়া গেল। ডাক্তারেরা চলিয়া গেলে মিত্রজা নিজের পীড়িত, রোগযন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহ লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় একই ভাবে পড়িয়া রহিলেন। সেই একই ঘর। চারিদিকে সেই পূর্ব্বেকার পুরাতন ছবিগুলি সাজান। মেজের সেই পূর্ব্বেকার ম্যাটিং পাতা, দুয়ারে সেই একই পর্দ্দা, দেহে সেই একই প্রকার যন্ত্রণা। যন্ত্রণাও যতই বাড়িয়া চলিল রামপ্রসন্নও ততই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ছুঁচ ফুটাইয়া দেহে অহিফেনের আরক অন্তর্নিক্ষেপ করা হইল। ঔষধের গুণে রামপ্রসন্ন অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। রামপ্রসন্নের যখন জ্ঞান হইল তখন সন্ধ্যাকাল। চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার বোধ হয় বলিয়া গিয়াছিলেন, তাই ভৃত্যদের মধ্যে কেহ তাঁহার জন্য খানিকটা মাংসের ক্বাথ লইয়া আসিল। রামপ্রসন্নের গিলিতে কষ্ট হইতেছিল। দুই এক চামচ খাইয়া আর খাইতে পারিলেন না। আবার সেই অসীম নিরানন্দ, সেই চিরন্তন একঘেয়ে ভাব। অবশেষে পূর্ব্বের ন্যায় সেই দীর্ঘ শান্তিহীন বিনিদ্র রজনী। রাত্রি

৭টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া মিত্র-গৃহিণী একবার ভর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মুখে পাউডার মাখা, গায়ে গলানীচু লেস্ আঁটা হাল ফ্যাসানের ব্লাউস্। রামপ্রসন্ন পত্নীর এই অসাময়িক বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়া বড়ই চটিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু মনে পড়িল আজ সকালেই ছেলেদের থিয়েটার যাওয়ার কথা উঠায় তিনিই জোর করিয়া বক্সের টিকিট কিনাইয়াছেন সুতরাং এখন আর রাগ করাটা ভাল দেখায় না। এই লইয়া এখন কথান্তর হইলে মাঝ থেকে ছেলেদের আমোদ-আহ্লাদ সবই মাটি হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ আজ সাহেব পাড়ায় বিলাতি থিয়েটারে ভারতীয় ধর্ম্মবিষয়ক নাটকের অভিনয় হইবে বলিয়া সহরময় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নানাবিধ রঙ্গীন বিজ্ঞাপনে অভিনেতৃবর্গের মনোবিমোহন সাজসজ্জা ও রঙ্গালয়ের দৃশ্য-পটাদির সৌন্দর্য্য ঘোষিত হইতেছে। এরূপ রঙ্গালয়ে এ হেন ভূমিকায় বিলাতের বিখ্যাত অভিনেত্রীর অভিনয়কলা দর্শন করিলে একাধারে নীতিশিক্ষা ও সৌন্দর্য্য জ্ঞান উভয়ই পরিস্ফুট হইবার কথা। তাই তখন মিত্রজা বিনা ওজরে ছেলেদের থিয়েটারে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন; পরে সেই ছেলেদেরই মুখ চাহিয়াই পত্নীর বিসদৃশ বিবিয়ানারও কোনও রূপ প্রতিবাদ করিলেন না। হিমানী বেশ বাহ্যিক স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতার সহিত স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বিবেকের তাড়নাজনিত কেমন একটা ভিতরকার সঙ্কোচ কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই একবার স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা

করিল—"এখন শরীরটা কেমন বুঝ্ছো, একটু সুস্থ বোধ হচ্ছে তো ?"

হিমাঙ্গীর এ প্রশ্নটী কথা কহিবার ছুতা মাত্র। শরীরের বিষয় যে রামপ্রসন্নের নূতন কিছু বলিবার নাই তাহা সে ভালরূপই জানিত! কিন্তু রুগ্ন স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া কথা না কহিয়া ফিরিয়া যাওয়া ত ভাল দেখায় না। একটা কিছু বলিয়া ত বাক্যালাপ করা চাই। তাই বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা রমণী স্বামীর মন ভিজাইবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল—"আমার কি আর ও সব ছাই দেখ্তে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু করি কি, এদিকে এত টাকা দিয়া বক্সের টিকিট কেনা হ'ল, তারপর অনেক দিন থেকে হবু জামাইটি ধরে বসেছে যে ছেলেদের একবার ইংরাজী থিয়েটার দেখিয়ে নিয়ে আসবে। তা মেয়েটাকে ত তার সঙ্গে একলা পাঠাতে পারিনে, একজন ভারিকৃকি লোক অভি-ভাবকের মত সঙ্গে না থাক্লে কি ভাল দেখায়? কি করি এখন পাকাপাকি গোছ কথাবার্ত্তা হয়েছে, তার অনুরোধটাই বা ঠেলি কি করে? মেয়ের মা হয়ে জন্মান কি কম জ্বালা। এ ত আর সখ করে যাওয়া নয়। তাহ'লে কি তোমায় একলা এ অবস্থায় ফেলে ঘর ছেড়ে যেতে পা উঠে? তা নলিন ছেলেটি বড় ভাল। লীলা তোমাকে দেখ্তে আসছিল, সে বল্লে আমিও যাব। তা তাদের একবার ডাক্‌ব কি ?"

মেয়েটী প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিল। যৌবনদশায় পদার্পণ করিয়া বালিকার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যেন অপূর্ব্ব পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত

হইয়াছে। পরণে বেশ জমকালগোছ সাড়ী, গায়ে জননীর ন্যায় আঁটা শাঁটা নীচু গলা বিবিপছন্দ ব্লাউস। দেখিলে মনে হয় যেন নিটোল দেহের অঙ্গসৌষ্ঠব গোপন না রাখার উদ্দেশ্যেই সে এই বেশ ভূষা করিয়াছে। রামপ্রসন্ন বড়ই সন্তানবৎসল ছিলেন। কিন্তু মেয়েটীর চেহারায় তাঁহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতির লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পিতার এই কঠিন রোগে, তাঁহার এই অসহ্য যন্ত্রণায়, দয়া মায়া দূরে থাক্, তাহার মুখে যেন কেমন একটা রোষ বা আক্রোশের ভাব দেখা যাইতেছিল; যেন মিত্রজাই তাহার সুখের অন্তরায়। তিনি এমনি করিয়া অসুখে পড়িয়া না থাকিলে এতদিন তাহাদের বিবাহ হইয়া যাইত, এমন করিয়া আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিত না। কুমারী লীলা ওরফে লিলি মিস্ বাবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যে পিতার মৃত্যুনিবন্ধন তাহার দাম্পত্যবন্ধনে প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে সে স্বয়ং যমরাজকেও ছাড়িয়া কথা কহিবে না। নলিন স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতঃ আসিতে ইতস্ততঃ করিতেছে বুঝিয়া গৃহিণী তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। মিঃ নলিন ঘোষ বিলাতের সাইবেনসেষ্টার হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া ডেপুটি কালেক্টারের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বয়স বছর ২৮ বৎসরের অধিক হইবে না। একে বিলাত ফেরত, তাহাতে আবার বিলাতি থিয়েটারে যাইতেছেন সুতরাং মিঃ ঘোষ রীতিমত ইংরাজী সান্ধ্য পোষাকে সজ্জিত। ঘোষ সাহেবের বেশ বিন্যাসের কিছু ক্রটী ছিল না। মাথায়

আধুনিক ভঙ্গিতে চেরা সিঁতি। গোঁপ দাড়ি কামান। দীর্ঘ গ্রীবা পালিস করা উঁচু কলারে সুরক্ষিত। পরণে টাইট পাজামা। নীচু ওয়েষ্ট কোটটিরও ছাঁট কাঁট হাল ফ্যাসানের। মিঃ নলিন একহাতে সাদা দস্তানা আঁটিয়া অপর হাতে অবশিষ্ট দস্তানাটি সময়োপযোগী নরম টুপীর সহিত ধারণ করিয়া সাহেবী ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রামপ্রসন্ন হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন নলিনের পিছনে পিছনে তাঁহার পুত্রটীও কখন চুপি চুপি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে কিন্তু কেহই পিতৃসন্নিধানে আসিবার জন্য অনুরোধ করে নাই। রামপ্রসন্ন জানিতেন হারাধনের ন্যায় তাঁহার এই একমাত্র আত্মজটিও তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও সহানুভূতি পোষণ করিয়া থাকে। ছেলেটি কিন্তু মুখ তুলিয়া বাপের দিকে চাহিতে পারিল না। তাহার চোখ দুটির নীচে কালো দাগ ও অস্বাভাবিক লজ্জাশীলতা দেখিয়া রামপ্রসন্ন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে কুসঙ্গে পড়িয়া পুত্রটি নানাবিধ কদভ্যাস শিক্ষা করিয়াছে। ছেলেটির ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া রাম-প্রসন্নের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। সকলে মিলিয়া রামপ্রসন্নকে ঘিরিয়া বসিয়া এক একবার তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিল। তারপর সব চুপ, কিছু বলিবার থাকিলে বলিবে। কিন্তু স্ত্রীজাতি কতক্ষণ মুখ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? রূপা বাঁধান টয়লেট্ ব্রস্ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। সেটি কাহার কাছ হইতে হারাইয়া যাওয়া সম্ভব, তাই

লইয়া মায়ে ঝিয়ে এক পালা ছোট খাট ঝগড়া হইয়া গেল। মিঃ নলিনও এ সময়ে ভদ্রতার অনুরোধে একটা কিছু লইয়া কথাবার্ত্তা কহা আবশ্যক মনে করিয়া করিয়া ইওরোপের বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা বার্ণার্টের উত্থাপন করিলেন। রামপ্রসন্ন প্রথমটা অন্যমনস্ক ছিলেন। ঘোষ সাহেবের কথায় তেমন কান দেন নাই। হঠাৎ বিশ্ববিশ্রুত অভিনেত্রী সারা বার্ণার্টের নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সারাকে দেখেছ নাকি?" নলিন বলিল—"আজ্ঞা হাঁ, বিলাতে থাক্‌বার সময় একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম।" সারা বার্ণার্টের অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমশঃ অভিনয় কলার আর্ট ও বাস্তবতা বিচারে পর্য্যবসিত হইল। মিত্র-গৃহিণী ও মিত্র-কন্যা উভয়েই সোৎসাহে পরস্পর বিরুদ্ধ নিজ নিজ মত অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানে কথাবার্ত্তা জিয়াইয়া রাখাই বিচারে বিতর্কের উদ্দেশ্য, সেখানে আর এ সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসার সুযোগ কোথায়! এই সকল কথা-বার্ত্তার ভিতরে রামপ্রসন্নের দিকে কেহই আর বড় লক্ষ্য রাখেন নাই। হঠাৎ তাঁহার দিকে মিষ্টার ঘোষের একবার নজর পড়ায় তিনি যেন কেমন 'অপ্রস্তুত' ভাবে সহসা গম্ভীর হইয়া বসিলেন। তাঁহার এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আর সকলেও রামপ্রসন্নের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন যে মরণাহত গৃহস্বামী তাঁহাদের দিকে কট্‌মট্ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। রাগে তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। রামপ্রসন্নের রোষকষায়িত নেত্রে স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছিল যে পরিজনের

এইরূপ হৃদয়হীন ব্যবহারে তাঁহার আর ক্রোধের ইয়ত্তা নাই। এ সময় রোগীর চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া দিলে তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু উপস্থিত কাহারো মুখ দিয়া আর কথা ফুটিল না। রোগশয্যায় কতক-ক্ষণই বা এম্‌নি করিয়া চুপ করিয়া থাকা যায়? কিন্তু নিস্তব্ধতা দুর্ভর বলিয়া বোধ হইলেও কেহ আর আপনা হইতে টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করিল না। সকলেরই ভয় পাছে লোক দেখান ভদ্রতা করিতে গিয়া তাহাদের মনের প্রকৃত ভাবটী প্রকাশ হইয়া পড়ে। অবশেষে কুমারী লীলা কোনও প্রকারে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের একটা শেষ করিয়া ফেলাই স্থির করিয়া পিতৃপ্রদত্ত সুন্দর সোণার ঘড়িটি দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন—"যদি যেতেই হয়, তাহা হইলে আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।" পিতার কাছে, মিস্ লীলার নিজ মনের ভাব গোপন রাখারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুখ খুলিতে না খুলিতেই আসল কথাটী ফাঁস হইয়া গেল। লীলা কথা কয়টী বলিয়া ফেলিয়া একটু থতমত খাইয়া ঈষৎ লজ্জিত-ভাবে নিজ প্রেমাস্পদের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন। এই উপলক্ষে দুজনের মধ্যে চোখের ইসারার গোপন বিনিময় হইয়া গেল। কান্তা যেন কান্তকে কি একটা বিস্মৃত কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। "কি যে বার্ত্তা নয়ন তা কহিল নয়নে।" এই সকল ব্যাপারে দুই মিনিটও সময় লাগিয়াছিল কিনা সন্দেহ। দেখিতে দেখিতে মেয়েরা অঞ্চলের খস্ খস্ শব্দের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। গাড়ী-

বারাণ্ডায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলেই ত্বরিত পদে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া নিজ স্থান অধিকার করিলেন। গাড়ী থিয়েটার অভিমুখে রওয়ানা হইল। তাহারা চলিয়া গেলে রামপ্রসন্ন একটী আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রোগযন্ত্রণা সহজে দূর না হয় না হউক মিথ্যার বেড়াটা ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই একই যন্ত্রণা! একই দুশ্চিন্তা! আগের চেয়ে বাড়ে নাই বটে, কিন্তু কমিতেছেই বা কোথায়? এদিকে দেহের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া আসিতেছে। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতই না চলিয়া যায়, সময়ের মন্থর গতির যেন আর বিরাম নাই, কিন্তু যে ভয়াবহ নিয়তির হাত এড়াইবার আর উপায় নাই, তাহাও যে অলক্ষ্যে নিশ্চিন্তভাবে অগ্রসর হইতেছে, সেদিকে আর কাহারো লক্ষ্য নাই। হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া রামধনিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দুধ টুধ কিছু আন্‌ব কি?"

"না, তুই হারাধনকে ডাকিয়া দে।"

৯

মিত্র-গৃহিণীর বাটী আসিতে অনেক রাত্রি হইল। মনে বোধ হয় কেমন একটা অনুতাপ বোধ হইতেছিল, তাই ফিরিয়াই একবার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। পাছে রামপ্রসন্ন জাগিয়া উঠেন এই ভয়ে হিমানী পদাগ্রভাগে ভর দিয়া খুব ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু মিত্রজার আর ঘুম

কোথায়? তিনি পদশব্দ শুনিয়া, একবার চাহিয়া, তখনই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। হিমানী হারাধনকে বলিলেন—"তুই আর কতক্ষণ থাকৃবি—যা শু'গে যা, আমি বরং বসে থাকৃছি এখন।"

রামপ্রসন্ন শুনিয়া তাড়াতাড়ি চোখ খুলিয়া বলিলেন—"না না, যাও তুমি শোওগে যাও।"

"তোমার এখনও খুব কষ্ট হচ্ছে নাকি?"

"তা বলে আর কি হবে।"

"তা হ'লে একটু মর্ফিয়া দিই।"

রামপ্রসন্ন আপত্তি করিলেন না। মর্ফিয়া সেবন করাইয়া হিমানী কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর রাত্রি প্রায় তিনটা চারিটা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ চেতনাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন বটে, কিন্তু যন্ত্রণার অবসান হইল না। অহিফেনের ঘোরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন কয়েকজন ষণ্ডামার্ক লোক তাঁহাকে ধরিয়া জোর করিয়া একটা কাল থলিয়ার মধ্যে পুরিতেছে। থলিয়ার অপ্রশস্ত মুখে তাঁহার স্থূলোদর আটকাইয়া গিয়াছে, তাহারা যতই ঠেলিতেছে—তাঁহার কেবল যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। দেহের বাকী অংশ কোন মতেই থলিয়ায় আবদ্ধ হইতেছে না, ভয়ে ও যন্ত্রণায় হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে রামপ্রসন্ন যেন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে হঠাৎ যেন কেমন করিয়া আততায়ীদের হাত ছাড়াইয়া তাহার থলিয়াচ্যুত দেহখানি নীচে পড়িয়া

যাইতেছে বলিয়া মনে হইল, রামপ্রসন্নের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি চাহিয়া দেখিলেন, বিশ্বস্ত সেবক হারাধন তাহার গরম মোজায় ঢাকা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট পা-দুইটি তখনও কাঁধে করিয়া বসিয়া আছে।

চ'খে আলো লাগিবে বলিয়া বাতিদানের উপর রেশমের ঝালর লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেটি ঠিক তেমনি রহিয়াছে, এদিকে যন্ত্রণাও ঠিক পূর্ব্ববৎ।

রামপ্রসন্ন মৃদুস্বরে বলিলেন—"হারাধন, এবার তুমি যেতে পার।"

"আজ্ঞে যাব কেন—আপনি সুস্থ হন, আমি এখানেই বসে আছি।"

"না, তুমি এখন যাও।"

রামপ্রসন্ন পা ছড়াইয়া কাত হইয়া শুইলেন—শুইয়া কেবল নিজ কষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন। হারাধন পাশের ঘরে যাইতেই মিত্রজা আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। তিনি বালকের ন্যায় অধীর হইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দন যেন আর থামিতে চাহে না। নিজের নিঃসহায় ও অসমর্থ অবস্থা, রোগশয্যার জনহীন একাকিত্ব, মানুষের নিষ্ঠুরতা, ঈশ্বরের দয়াহীনতা এ সব যতই মনে পড়ে রামপ্রসন্ন ততই কাঁদিয়া আকুল, শেষে কি পরম কারুণিক বিশ্বপিতাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন?

রামপ্রসন্ন উন্মত্তের ন্যায় ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে

লাগিলেন—"প্রভু তোমার কি এই বিচার? কেন আমাকে এ অবস্থায় আনিয়া ফেলিলে। আমি কি এমন অপরাধ করিয়াছিলাম? কেন আমাকে অহরহঃ এই ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছে," কে এ সব প্রশ্নের উত্তর দিবে? উত্তর মিলিবে না বলিয়াই মিত্রমহাশয়ের এই হতাশ ক্রন্দন?

আবার বেদনা বাড়িতে লাগিল। রামপ্রসন্ন এবার নড়নচড়ন বিহীন, আর ছট্‌ফটানি নাই, চীৎকার নাই, চুপ করিয়া পড়িয়া আছেন, আপন মনেই বলিতেছেন, "আচ্ছা খুব লাগাও, খুব বিঁধাও, যত পার যন্ত্রণা দাও, যত পার আঘাত কর, কেন? কি করেছি তোমার? কিসের জন্য এত আক্রোশ?"

কিছুক্ষণ পরে রামপ্রসন্নের মন আপনা হইতে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল, ক্রমে কান্নার বেগ থামিয়া গেল। বক্ষের স্পন্দন কমিয়া আসিয়া হৃৎপিণ্ড যেন নিশ্চল হইয়া পড়িল—এত স্থির যে নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। মনের ভিতর যে ভাবপ্রবাহ বহিতেছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া মিত্রজা অন্তরাত্মার বাণীর জন্য সোৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে মনে হইল, ভিতর হইতে কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কিসের জন্য এত দুঃখ বাপু, কি চাও?"

রামপ্রসন্ন আত্মগত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "কি চাই? চাই—যাতে এ যন্ত্রণাভোগ করিতে না হয়, যাতে না আর কষ্ট পাইতে হয়, মৃত্যু চাই না—চাই জীবন।

রামপ্রসন্ন পুনরায় একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিলেন যথাশক্তি

এই দিকেই মনোনিবেশ করায় দেহের কষ্টও যেন আর সে সময় অনুভূতির মধ্যে আসিতেছিল না। মনে হইল ভিতর হইতে প্রশ্ন হইতেছে "বাঁচিতে চাও, আচ্ছা জীবনই যদি তোমাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তুমি কাটাইবে কি করিয়া?"

"কেন পূর্ব্বের মত—সুখে-আনন্দে-ভদ্রভাবে।" এবার আর কিছু প্রশ্ন নাই, শুধু শুনা গেল "বেশ বলিয়াছিস্ সুখে—আনন্দে—ভদ্রভাবে।" রামপ্রসন্ন এবার মনে মনে গত জীবনের সুখের একটা তালিকা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আগে অতীত যেরূপ সুখ-বহুল বলিয়া মনে হইত, এখন খুঁজিয়াও সেরূপ সুখ মুহূর্ত্তের আধিক্য দেখা গেল না। যা কিছু মনে পড়িতে লাগিল তাও আবার সেই বহু পূর্ব্বের শৈশবকালের কথা। হাঁ তখন বরং জীবনে একটা স্বাদ বোধ হইত, বাঁচিয়া থাকায় আনন্দ ছিল বটে। আহা! আবার যদি সেই শৈশবকাল ফিরিয়া আসে, কিন্তু যে রামপ্রসন্ন শিশুকালে এই সকল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল, সে ত আর নাই, এখন প্রৌঢ়তায় পদার্পণ করিয়া তাহাকে যে অপর কেহ বলিয়া বোধ হয়।

শিশু রামপ্রসন্নের পরিণতবয়স্ক রামপ্রসন্নে পরিণতির কথা চিন্তা করিতে গিয়া আপাতদৃষ্টিতে যাহা কিছু সুখ-স্মৃতি বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহা একে একেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

মিত্রজা ভাবিতে লাগিলেন—'তবে কি না বুঝিয়া তরুণবয়সে এ গুলিকে সুখ ঠাওরাইয়াছিলাম? এখন যে সবই উল্টা দেখিতেছি, কোন্‌টি বা তুচ্ছ চপলতা, কোন্‌টি বা ঘৃণাজনক নীচতামাত্র।'

রামপ্রসন্ন ভাবিয়া দেখিলেন, শৈশব দূরে রাখিয়া যৌবনসীমা হইতে যতই বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, তথাকথিত সুখ-গুলিও ততই ফাঁকা ও সন্দেহযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। ধরিতে গেলে "ল" পড়িবার সময় হইতেই ইহার আরম্ভ। প্রথম প্রথম তবুও অনেকটা খাঁটি জিনিষ ছিল। সদাহৃষ্ট চিন্তাক্ষোভশূন্য চিত্ত, স্বার্থলেশহীন বন্ধুত্ব, সীমাহীন আশা ইহার কোনটাই ফেলিবার সামগ্রী নহে। কিন্তু ক্রমেই আইন কলেজের উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া ব্যবহারাজীবগোষ্ঠীতে প্রবেশ লাভের শুভ সময় যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, প্রকৃত সুখের দর্শনলাভও ততই কঠিন হইয়া পড়িতেছিল। প্রথম প্রথম সেটেলমেণ্টের চাকরী করিবার সময় সুখ আসিয়া মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিতেন বটে, কিন্তু মিত্রমহাশয় এদিকে চাকরীতে যত পরিপক্কতা লাভ করিতে লাগিলেন, সুখ সৌভাগ্যের কোঠায় মেকির সংখ্যা ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এ ভেজালের ভিড়ের ভিতর লুপ্তপ্রায় এক আধটি খাঁটি আনন্দের আবিষ্কার করাও সুকঠিন। ক্রমশঃ বছর-গুলিও যেমন জলের মত বহিয়া যাইতে লাগিল, রামপ্রসন্নের পক্ষে প্রকৃত সুখ আস্বাদনের ক্ষণিক সুযোগও ততই বিরলতর হইতে লাগিল। বিবাহ—সেও একটা দৈব-দুর্ঘটনা বলিলেও হয়, তাহার পর কি ভ্রান্তি হইতেই না, মুক্তি লাভ। মোহ হইতে কি ভয়াবহ জাগরণ। স্ত্রীর বিরুদ্ধভাব, অকারণ বিরক্তিজনক ব্যবহার, কুটিল কাপট্য, ইহার কোন্‌টিই বা না স্মৃতিপটে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। সংসার-সুখের এ শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে না কেন?

তাহাদের সে বন্ধন ত ভালবাসার পবিত্র বন্ধন নহে, ইন্দ্রিয় লিপ্সার আবেগমাত্র।

তার পর এই হতভাগা চাকরী—এক এক করিয়া বিশ বৎসর কাটিয়া গেল। তবু কি ছাই অভাব ঘোচে? অর্থকষ্ট অনাটন যেন সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া আছে। আরও বিশ বছর ধরিয়া এমনি করিয়া প্রাণান্ত করিলেও ব্যর্থ নিষ্ফলতা পূর্ব্বেরই ন্যায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এতদ্দিনে মিত্রজার মনে হইতে লাগিল কি ভ্রমেই না পড়িয়াছিলাম—যখন হুহু করিয়া "পাতাল পানে" নামিয়া যাইতেছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল শনৈঃ ঊর্দ্ধে ত্রিদিব পথে অগ্রসর হইতেছি। এমন ভুল কি মানুষের হয়? দশের কাছে গণ্যমান্য হইয়া মনে মনে যখন নিজ কৃতিত্বের বড়াই করিতেছিলাম, তখন কি জানি কোন্ ফাঁকে আমার প্রকৃত সাফল্যটুকু জীবনের দ্যূতক্রীড়ার পাশকের ন্যায় সহসা আমার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। আশা ভরসা ত সবই শেষ হইয়াছে, আর মিছা অনুশোচনায় ফল কি? এখন পরিণাম শুধু মৃত্যু!

হঠাৎ রামপ্রসন্নের চিন্তাস্রোত উজান বহিতে লাগিল। রামপ্রসন্ন নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তাই কি কখন সম্ভব হয়? এ অন্ত্যজনের কি এতই অপরাধ? কেন আমি কি এতই অযোগ্য? আচ্ছা সত্য সত্যই যদি নির্ব্বোধের ন্যায় অনুচিতভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকি, তাহা হইলেই বা মরিতে হইবে কেন? এর জন্য এত কষ্টই বা ভোগ করিব কেন? ইহার কি কোনও অর্থ আছে? এ কোন্ দেশীয় ব্যবস্থা? (ইহার কি

কোনও অর্থ আছে ?) না নিশ্চয়ই কোথাও একটা বড় রকম ভুল হইয়া গিয়াছে।”

এই স্বগতোক্তির ভিতর মিত্রজার সন্দেহের অন্ধকার ভেদ করিয়া সত্যের একটা আভাস ক্ষীণ আলোকচ্ছটার ন্যায় কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য প্রকাশ পাইল, কিন্তু তাহাতে আর স্থায়ী ফল কোথায় ? সত্য ও অনন্তের এই ক্ষীণরশ্মি-সম্পাতে রামপ্রসন্নের একবার মনে হইল না, বোধ হয় ভুলই করিয়াছিলাম, জীবন যেমনটি করিয়া যাপন করিতে হয়, তেমনটি করিয়া হয় তো করিয়া উঠিতে পারি নাই ; কিন্তু পরক্ষণেই মোহ আসিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল ‘সে কি কথা ? সভ্যসমাজের যেটুকু আবশ্যক কোন্ দিন তাহাতে তুমি অবহেলা দেখাইয়াছ ?’ মিত্রজা ভাবিলেন, তাই ত আমি তো চিরদিন সমাজ ও লোকমতকে যথাবিধি মান্য করিয়াই চলিয়াছি, তবে আবার জীবন-যাত্রার ভুল করিলাম কোথায় ? জীবন ও মৃত্যু রহস্য সমাধানের যাহা একমাত্র ধ্রুব উপায়, রাম-প্রসন্ন তাহার ইঙ্গিত পাইয়াও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। মিত্রজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “আচ্ছা এখন তা’হলে আর চাই কি ? শুধু জীবন ? তা সে জীবনই বা কেমনতর ? কেন সেই আগেকার আদালতে গিয়া হাকিমী করা, ঢুকিবার সময় চাপরাসী পাহারাওয়ালারা উপস্থিত লোকদের সতর্ক করার জন্য চীৎকার করিয়া বলিবে—“এই—চোপরাও—হাকিম আতা”—সে না হয় হইল ; কিন্তু এ দিকে যে আমার জীবন মামলারও আর রায় প্রকাশ হইতে বিলম্ব নাই—ত্রিজগতের বড় হাকিম বোধ

হয় এইবারই রায়টা দিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আমি দোষী সাব্যস্ত হইতে যাইব কেন? কি অপরাধ আমার? কি করেছি যে দোষী হইব। আমার দণ্ড লইতে হইবে?" রামপ্রসন্নের কান্না অনেকক্ষণ হইতেই থামিয়া গিয়াছিল। তিনি দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া অধীরভাবে বার বার (নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন) "কেন এ সব সহ্য করিতে হইবে? কেন এ কঠিন দণ্ডবিধান?" কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া পাশমোড়া দিয়া যতবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনবারই এ প্রশ্নের কোন জবাব মিলিল না। যতবার মনে হইল, জীবন ভালভাবে কাটাই নাই বলিয়াই এখন এ কষ্ট পাইতেছি, মিত্রজা ততবারই নিন্দা সম্পর্ক শূন্যভাবে লোকমত মানিয়া চলার ওজুহাতে এ ধারণা নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বর্জ্জন করিলেন।

১০

আর দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, রামপ্রসন্ন এখন আর বিছানা হইতে উঠিতে পারেন না। এদিকে চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকিতেও ভাল লাগে না। এই কয়দিন এক পাশে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া পড়িয়া আছেন। মন শুধু সেই অব্যাখ্যেয় অবুদ্ধিগম্য রোগ-যন্ত্রণার চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত। এক একবার অধীরভাবে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'এ যন্ত্রণার কারণ কি? মরণ ছাড়া কি ইহা হইতে আর অব্যাহতি নাই!' মনের ঠাকুর ইহার আর কি উত্তর দিবেন, কেবল বলেন, 'হা বাপু মরণ

ছাড়া আর পথ কোথায় ?' 'তা হলে এ যন্ত্রণা ভোগ কেন ?' 'যন্ত্রণা ত ভুগিতেই হইবে, তাহার আবার কেন কি ?' ইহার বেশী আর কোনও জবাবই পাওয়া যায় না। প্রথম ডাক্তার দেখানর পর হইতেই রামপ্রসন্নের জীবন যেন দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধারায় বিভক্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একটী পর্য্যায়ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়া অপরটিকে মোটেই আমলে আসিতে দিত না। মাঝে মাঝে হতাশায় তাঁহাকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। মৃত্যু সম্বন্ধে অবোধগম্য ধারণাগুলি তাঁহাকে যেন নিজভারে পিষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিত। আবার রামপ্রসন্ন কথনও কথনও বা আশায় উৎফুল্ল হইয়া দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের ক্রিয়াদি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতেন। ক্রমে এইরূপ দৈহিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া হঠাৎ মূত্রাশয় ও রোগদুষ্ট (appendix) অন্ত্রাংশের কথা মনে পড়িয়া যাইত। এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে পুনরায় সেই দুর্ভাবনা ও মৃত্যুভয়ের সন্নিধান আসিয়াই পৌছাইতে হইত। এই দুয়ের হাত ছাড়াইয়া যেন পলাইবার কোন উপায়ই ছিল না।

এই দিকে ব্যারাম ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রোগীর মানসিক অবস্থার আর কিছু পরিবর্ত্তন হইল না বটে, শুধু দেখা গেল যে মোটামুটি মূত্রাশয়াদির সংস্থান সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ ধারণা যতই অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, মৃত্যু-ভয় ততই যেন স্ফুটতর হইয়া পড়িতেছে। এই তিনমাসে তাঁহার শরীরের যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কিরূপ শীর্ণ ও দুর্ব্বল

হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা একবার স্মরণ করিলেই রোগমুক্ত হওয়ার দুরাশা আর তাঁহার মনে স্থান পাইত না। এই কয়দিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় এক কাতে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া পড়িয়া থাকিয়া মিত্রজা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে বহু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত লোক থাকা সত্ত্বেও এই জনবহুল মহানগরীর মধ্যে তাহার ন্যায় একাকী বোধ হয় আর কেহই নাই। এরূপ একক সঙ্গহীনতা বুঝি বা সাগরতলে বা নির্জ্জন ভূগর্ভেও খুঁজিয়া মেলা অসম্ভব। নিকটে আপনার বলিতে কেহই নাই, আছে শুধু অতীতের স্মৃতিরাশি মাত্র। একটীর পর একটী করিয়া গত জীবনের ঘটনা-সমূহ আপনা হইতেই মানসপটে উদিত হইতে থাকে। ভূত বা বর্ত্তমান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সেগুলি সুদূর অতীতে অগ্রসর হয়। বায়স্কোপের জীবন্ত চিত্রের ন্যায় এই সকল 'স্মৃতি দিয়া গড়া' ছবিগুলিও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে, তবে অতীত হইতে বর্ত্তমানে না আসিয়া ভূতকাল হইতে অতীতে চলিয়া যায় এইটুকুই যা পার্থক্য।

অরুচি ও মুখের বিস্বাদ নিবারণের জন্য পথ্যের সহিত একদিন দুই একটী আমলকীর মোরব্বা প্রেরিত হওয়ায় মিত্রজার বাল্য-কালে হরিতকীর ও আমলকীর মোরব্বা প্রভৃতির প্রথম স্বাদ গ্রহণের কথা মনে পড়িতে লাগিল। রামপ্রসন্নের পিতা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে যাইতে হইত। একবার তিনি সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে বীরভূম

গিয়াছিলেন। আসিবার সময় বালক-বালিকাদিগের জন্য সিউড়ির বিখ্যাত মোরব্বা কিনিয়া আনিয়াছিলেন। ভিতরে সূতার ন্যায় একটি আঁশ সংযুক্ত সাদা সাদা শতমূলির মোরব্বা চট্‌চটে রসে ঢাকা ফাটা ফাটা আমলকীর মোরব্বা প্রভৃতির কথা রামপ্রসন্নের মনে হইতে লাগিল। রামপ্রসন্ন দেখিলেন সদ্য ভুক্ত আহার্য্যের ন্যায় সেগুলির আস্বাদ এখনও যেন ঠিক মনে রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে শিশুকালের আরও কত খুঁটিনাটি কথা মনে আসিতে লাগিল। সেই হিন্দুস্থানী ঝি—বুড়ি দাই—সেই শৈশব-সঙ্গী ছোট ভাইটি, বাল্যকালের অমূল্য সম্পত্তি সেই নূতন পুরাতন ছোট বড় খেলনাগুলি, যেটির হয় ত হাত পা ভাঙ্গা অন্য সকলের চেয়ে সেইটির উপরই বেশী টান। শেষ জীবনে এই দৈহিক বা মানসিক কষ্টের বৈসাদৃশ্যে—সেই অপাপবিদ্ধ শিশু-কালের সুখেভরা স্মৃতিগুলি রামপ্রসন্নের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। মিত্রমহাশয় মৃত্যু-সঙ্গমে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে শৈশবের সেই কলগানরতা জীবন তটিনীর এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের বিষয় আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"না সে আর সেকালের কথা ভাবিয়া আর কাজ নাই, সে আনন্দের স্মৃতিটুকুও আর সহ্য করিতে পারি না।"

ক্রমে মিত্র মহাশয়ের চিন্তাস্রোত অতীত হইতে বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিল। হঠাৎ চামড়ার গদী আঁটা আরাম কেদারাখানির উপর নজর পড়ায় মিত্রজা লক্ষ্য করিলেন, পিঠ হেলান দেওয়ার

জায়গাটির মরক্কো চামড়ার কয়েকটা ভাঁজ পড়িয়া গিয়াছে, বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই সেই স্থানে ফাটিয়া যাইবে। হঠাৎ স্মরণ হইল চেয়ারে এই মরক্কো মোড়ান লইয়া গৃহিণীর সহিত তাঁহার একবার বিশেষ মনান্তর হইয়াছিল। রামপ্রসন্ন স্বগত বলিতে লাগিলেন—"খরচ করিয়া ও ছাই মরক্কো চামড়া না লাগাইয়া লইলেই বা কি হইত? শুধু বাহার বই ত নয়। টেঁকেও না—কিছুই না—কেবল পয়সা খরচমাত্র সার!" তার পর ছেলে-বেলাকার এইরূপ একটা মরক্কোঘটিত হাঙ্গামার কথা মনে পড়িল। রামপ্রসন্নের পিতার একটি সুন্দর মরক্কো নির্ম্মিত লিখিবার প্যাড্ ছিল। ছেলেবেলায় দুই ভাই একদিন সেটা লইয়া টানাটানি করিতে থাকায় তাহার সুদৃশ্য আবরণটি ছিঁড়িয়া যায়। সখের জিনিষটি নষ্ট করার জন্য রামপ্রসন্নের পিতা রাগ করিয়া পুত্রদ্বয়কে প্রহার করিয়াছিলেন। রামপ্রসন্নের স্মৃতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাই সকল ঘটনা আগাগোড়া মনে পড়িতেছিল, পিতার এই ক্রোধ প্রসঙ্গে স্নেহময়ী জননীর কথাও মনে পড়িল। রামপ্রসন্ন মনে মনে বলিলেন—"বাবা সে দিন মারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মা আমাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দোকান হইতে সন্দেশ আনাইয়া দেওয়াইয়া-ছিলেন।" ছেলেবেলাকার কথা এইরূপে পুনরায় স্মরণ-পথে আবির্ভূত হওয়ায় হৃদয়ের বেগ সংবরণ করা রামপ্রসন্নের পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠিল। মিত্র মহাশয় জোর করিয়া এ সব ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শৈশব-স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের রোগ সংক্রান্ত নানা কথা

চিন্তাপ্রবাহে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া যাইতে লাগিল। ব্যারামটি কেবল অল্পে অল্পে আরম্ভ হইয়া শেষে কিরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যন্ত্রণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন ক্রমশঃ কিরূপ দুর্ব্বহ হইয়া পড়িতেছে, এই সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রে ক্রমেই তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দূর অতীতে জীবনপ্রভাতে যেন একটু সুখের ভাতি দেখা যাইত, কিন্তু ঘনাচ্ছন্ন কুহেলী আঁধার ক্রমেই সে বিমল জ্যোতির ক্ষীণ রেখাটিও গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। অতীতের সুপ্রশস্ত বর্ত্মে রামপ্রসন্নের দৃঢ়নিবদ্ধ মনশ্চক্ষু যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিল, সে সুখ ও সৌন্দর্য্যের পবিত্র নিদর্শনগুলি কোথায় কোন্ সুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে, ফিরিয়া গিয়া তাহাদের কাছে পৌঁছাইবার আর উপায় নাই। পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন ক্রমেই অধিকতর বেগে খাদ বা গিরি পার্শ্বস্থ অতলস্পর্শ গহ্বরে পতিত হইতে থাকে রামপ্রসন্নের দুঃখভার প্রপীড়িত জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনারাশি মৃত্যুযন্ত্রণার ভিতর দিয়া সেইরূপ সমৃদ্ধবেগে মরণ বা নিষ্কৃতি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। ক্ষণকালের জন্য চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া রামপ্রসন্ন শূন্য দৃষ্টিতে সোফার পিছন পানে চাহিয়া রহিলেন। সম্মুখের কোন জিনিষই আর নজরে পড়িতেছে না। মন যে কোথায় পড়িয়া আছে তাহার আর ঠিক নাই। শুধু লক্ষ্যহীন অনন্তের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। উদাসভাবে যেন শুধু শেষ খেয়ারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। হঠাৎ মিত্রজার মনে হইতে লাগিল যেন তিনি শূন্যের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে নিম্নে

পড়িয়া যাইতেছেন। রামপ্রসন্ন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অঙ্গ বিক্ষেপের দ্বারা এই আকস্মিক পতন রোধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু করিলে কি হইবে, ব্যাধিদুষ্ট কল্পনা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি সহজে মিলে। মিত্রজার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল এবার আর কালের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন, আর বাধা দিতে গিয়া করিব কি? কোন ফলই দেখি না। কেবল এই দুঃখ—কিসে কি হইতেছে কিছুই বুঝিলাম না। যদি অপর পাঁচ জন বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানের ন্যায় সৌজন্য ও ন্যায়পরায়ণতার খ্যাতি বজায় রাখিয়া সসম্মানে জীবন-যাপন না করিতাম, তাহা হইলেও না হয় বুঝিতাম নিজের দোষেই ভুগিতেছি। কিন্তু যে অপরাধ জীবনে কখনও করি নাই, রোগ দুঃখাদির একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহাই বা অনর্থক স্বীকার করিয়া লইব কি করিয়া? আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কথায় এই দুঃখের উপরও রামপ্রসন্নের শুষ্ক ওষ্ঠে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। এ হাসিটুকু আত্মবিস্মৃতির হাসি নহে। যেন কাহারও প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উহার উদ্ভব।

মিত্রজা এ ভাবনা-সাগরে আর থই পাইলেন না। শেষে আশাহীন ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন—"না কোন কারণই খুঁজিয়া পাই না—কেনই বা মৃত্যু, কেনই বা যন্ত্রণা? এ সব যে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।"

১১

সপ্তাহখানেক পরে মিত্রদম্পতির একটি দীর্ঘকাল পোষিত অভিলাষ অবশেষে ফলবতী হইল। নবীন ডেপুটি শ্রীমান্ নলিন চন্দ্র লীলার পাণিপ্রার্থী হইলেন। যে দিন সন্ধ্যাকালে নলিনের পক্ষ হইতে এ প্রস্তাবটি উত্থাপিত করা হইল, তাহার পর দিবস মিত্র-গৃহিণী রুগ্ন-স্বামীর কাছে কথাটি কি করিয়া পাড়া যায়—এ সুসংবাদের কিরূপ মুখবন্ধ আবশ্যক—তাহাই ভাবিতে ভাবিতে পতিসন্দর্শনে যাইতেছিলেন। গতরাত্রি হইতে রামপ্রসন্নের শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। হিমানী দেখিলেন মিত্রজা সোফার (পালঙ্কের) উপর পড়িয়া আছেন। তবে অন্যদিনকার মত "কা'ত" হইয়া নহে একবারে "চিৎ" হইয়া। রামপ্রসন্ন বিস্ফারিতনেত্রে শূন্যদৃষ্টিতে ভিতরকার ছাদের কড়ি বরগার দিকে চাহিয়াছিলেন—কথা কহিবেন কি—তাঁহার কণ্ঠ দিয়া কেবল একপ্রকার অস্ফুট আর্ত্তস্বর মাত্র বাহির হইতেছিল। হিমানী মিত্রমহাশয়কে ঔষধ খাওয়ার সময় হইয়াছে এই কথাটি মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেই তিনি এরূপ ক্রোধ ও ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে প্রেয়সীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন যে মিত্র-গৃহিণীর অর্দ্ধোচ্চারিত কথা আর শেষ করিয়া উঠা হইল না। রামপ্রসন্ন ইঙ্গিতে পত্নীকে কাছে আসিতে নিষেধ করিয়া রোষগর্ভ বিদ্রূপের সহিত বলিলেন—"আমাকে সুস্থ হইয়া মরিতে দিতেও কি তোমাদের বিশেষ কষ্ট বোধ হইতেছে ?"

মিসেস্ মিত্র চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কুমারী লীলা পিতাকে সুপ্রভাত জানাইয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, এখন কেমন আছেন ?" রামপ্রসন্ন পত্নীর ন্যায় কন্যার প্রতিও নিরতিশয় ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত চাহিয়া তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"বাপু, আর তোমরা ব্যস্ত কেন ? আমার শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বেশী দিন তোমাদিগকে কষ্ট দিতেছি না।" ইহার পর—মা ও মেয়ে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া একত্রেই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে যাইতেই লীলা আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল,—"মা, শুন্‌লে বাবার কথা, যেন আমরাই তাঁর অসুখটা করিয়ে দিইছি—যেন সবই আমাদের দোষ। উনি যে এই কষ্ট পাচ্ছেন, তাতে সুখী আর কে আছে ; তবে মিছামিছি আর এমন করে ঝালঝাড়া কেন ?"

ডাক্তার যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামপ্রসন্ন অল্প কথায় "হাঁ" কি "না" বলিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন —মুখে সর্ব্বক্ষণই সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব।

ডাক্তার মহাশয়ের প্রশ্নমালা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া —মিত্রজা আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—"মহাশয় জানেন ত এ ব্যারাম সারিবার নয়, তবে আর মিছামিছি শেষ সময়ে রোগীকে জ্বালাতন করিয়া লাভ কি ?"

ডাক্তার। ব্যারাম না হয় না সারিল—আমরা অন্ততঃ যন্ত্রণাটাও ত দূর করিতে পারি।

রামপ্রসন্ন। তাই বা আর পারেন কোথায়? মাপ করিবেন, আমার আর চিকিৎসার প্রয়োজন নাই।”

ডাক্তার বসিবার ঘরে মিত্র-পত্নীর সাক্ষাৎ পাইয়া এইবার তাঁহাকে সাফ্ জবাব দিয়া গেলেন। রামপ্রসন্ন আর বড় জোর তিন চার দিন মাত্র বাঁচিবেন—এখন আর চিকিৎসা করা বৃথা—শেষ দুই এক দিন রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—তখন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অহিফেন বা মর্ফিয়া দেওয়াই একমাত্র ব্যবস্থা।

ডাক্তার যে বলিয়া গিয়াছিলেন, রামপ্রসন্নের শেষ কয়দিনে যন্ত্রণার অবধি থাকিবে না—সে কথা হাতে হাতেই ফলিল, কিন্তু শারীরিক সকল যন্ত্রণার চেয়ে নৈতিক বা মানসিক যন্ত্রণাটাই যেন তাঁহাকে সমধিক বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছিল।

গত রাত্রে নিদ্রালু হারাধনের সদা প্রফুল্ল মুখখানির দিকে চাহিয়া—মিত্রজার মনে এই ক্লেশের প্রথম উদ্ভব হয়। মিত্রসাহেব কেবলই ভাবিতেছিলেন—“সজ্ঞানে—জানিয়া শুনিয়া—জীবনতরণী কি সত্যসত্যই বিপথে চালাইয়াছিলাম।” এখন আয়ুশেষে প্রাজ্ঞ বিচারকের যথার্থই বিশ্বাস জন্মিল যে জীবনটা ঠিকভাবে যাপন করা হয় নাই। এ অবস্থায় এ কথা আর পূর্ব্বের ন্যায় অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। জীবনের হিসাব-খাতায় বাস্তবিকই যে বড় রকম একটা ভুল হইয়া গিয়াছে সে ঘোর সত্য আজ আর কে অস্বীকার করিবে?

সত্যের বিমল কিরণ-সম্পাতে রামপ্রসন্নের মনের পুঞ্জীভূত

অন্ধকার যেন হঠাৎ কাটিয়া গেল। পূর্ব্বে কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন প্রবেশ করিয়াই, রামপ্রসন্ন কয়েকটি সামাজিক ও সরকারী ব্যাপারে, দেশনায়কধনীবৃন্দ এবং উচ্চপদস্থ উপরওয়ালাদিগের অনুমোদিত —তাঁহাদিগের সেই তথাকথিত "অভ্রান্ত" ব্যবস্থাগুলির প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে দুই একবার ভয়ে ভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ চিত্ত-দুর্ব্বলতার জন্য অবিলম্বেই বিরত হইয়াছিলেন। এতদিনে মনে হইতে লাগিল যে তখনকার সেই নিষ্ফল প্রয়াসই তাঁহার কাছে সত্যপথের প্রেরণা বহন করিয়া আনিয়াছিল। যে শ্রেণীর সরকারী কার্য্যপ্রণালী, যে সকল সামাজিক আচারাদি এবং আত্মীয়বর্গের সহিত যে প্রকার সম্পর্ক ও আদান-প্রদান বজায় রাখাই তিনি "ন্যায্য" ও "ভদ্রতাসঙ্গত" বোধে এতকাল বুক দিয়া আঁকড়াইয়া ছিলেন "শেষের সে দিন" ঘনাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল ভ্রান্তধারণার মুখসগুলি আপনা হইতেই খসিয়া পড়িয়া গেল—এখন আর সেগুলিকে ঠিক্ মত চিনিয়া লওয়া কঠিন হইল না।

মিত্রমহাশয় পূর্ব্বজীবন সমর্থনকল্পে সামান্য চেষ্টা করিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে এতদিন যাহা খাঁটি বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন, তাহা যথার্থই অকিঞ্চিৎকর "ঝুটা চিজ্" মাত্র, বস্তুতঃ এখন সেগুলির পোষকতায় বলিবার বিষয় তিনি আর কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

মিত্রজা অব্যাহত চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। এখন দিন-শেষে সব কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বড়ই 'আপ্‌শোষ' হইতে

লাগিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আপন মনেই বলিতে লাগিলেন "শেষে কি এই হইল! সারাজীবনটা নষ্ট করিয়া এত দিনে বুঝিতে পারিলাম যে শুধু হেলায় কাল কাটাইয়াছি। এখন যে ইহার প্রতিকার করি সে উপায়ও নাই। যদি এই নিষ্ফলতার বোঝাই শেষ পথের সম্বল হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলেই বা আর কি উপায় করিব?"

রামপ্রসন্ন 'চিৎ' হইয়া পড়িয়া আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ প্রাতে যখন তাঁহার ভৃত্য হারাধন, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা এবং দর্শনী-লোলুপ বাক্যবাগীশ ডাক্তার মহাশয়—একে একে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের আকার ইঙ্গিতে, কথাবার্ত্তায় গতরাত্রের সেই জোর করিয়া জাহির হওয়া ভীষণ সত্যের কি প্রত্যেক বর্ণই সমর্থন করিতেছিল না। আজ উহাদের ভিতর দিয়া তিনি আপনাকে ভালরূপেই চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনিও ত তাহাদেরই ন্যায় লোক দেখান আচরণকেই ন্যায় সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতেন, কি ভ্রান্তি! কি আত্মপ্রতারণা! আজ সে সকল নিজরূপে প্রকাশ পাওয়ায় কি বিকট, কি ঘৃণিত, কি কদর্য্য বলিয়াই না বোধ হইতেছে। মনশ্চক্ষুর এই আকস্মিক উন্মোচন, নিজ পূর্ব্বাপরাধ সম্বন্ধে এই যে অবগতি, মিত্রজার আত্যন্তিক ক্লেশ ও চিত্তবৈকল্যের ইহাই মূলীভূত কারণ। এ কষ্টের যে আর উপশম নাই—ক্রমেই যেন 'শতগুণ' হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার উপর দেহের যন্ত্রণা ত আছেই। আর যে সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

মিত্রজা অস্ফুট আর্ত্তনাদের সহিত বিছনার উপর ছট্‌ফট্‌ করিয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন। গায়ে আঁটা জামাকাপড়ে যেন দমবন্ধ হইয়া আসিতেছিল। রামপ্রসন্ন তাই সেগুলি জোর করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন—ক্রমে তাঁহার যেন কেমন একটা ক্রোধোন্মত্ত ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। শুশ্রূষাকারী ভৃত্যটি বেগতিক দেখিয়া খানিকটা 'মর্ফিয়া' খাওয়াইয়া দিল। মিত্রমহাশয় কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন। দ্বিপ্রহরের সময় চৈতন্য হইতেই আবার সেই রোষোচ্ছ্বাস! মিত্রজা ঘর হইতে সকলকে হাঁকাইয়া দিয়া সোফার উপর পড়িয়া হাত পা ছুড়িতে লাগিলেন। ছট্‌ফটানি, কাপড় ছেঁড়া প্রভৃতি উপসর্গের কথা শুনিয়া হিমানী রামপ্রসন্নের কাছে আসিয়া একটা নূতন কথা পাড়িয়া ফেলিল—বলিল, "দেখ অসুখ বিসুখ হ'লে হিঁদুরা অনেকেই 'প্রাচিত্তির' করিয়ে উপকার পায়—তা আমাদের খৃষ্টানমতেও ত প্রায়শ্চিত্তির ব্যবস্থা আছে, তা কর্‌লে দোষটা কি? উপকার না হোক ক্ষতি ত কিছুই হবে না। অসুখে না পড়েও ত লোকে এ সব আক্‌ছা করে থাকে—তা লক্ষ্মীটি আমার কথাটি রেখে একবার রাজী হও।" রামপ্রসন্ন বলিলেন—"বুঝেছি—আমাকে একবারে অন্তিমের 'সেক্রামেণ্ট' নিয়ে তৈরি থাক্‌তে বল্‌ছ, কিন্তু তার তো প্রয়োজন বড় দেখ্‌ছি না, কেন? আমাকে যা করেই হোক একবারে—" হিমানী উক্তির এই অংশটুকু মাত্র শুনিয়াই কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বাষ্পাবেগ সংবরণ করিয়া বলিল—"এত মিনতি করে বল্‌ছি, তবু কথাটা রাখ্‌বে

না—? যদি বলো তো বুড়ো পাদরী সাহেবকে খবর দিয়ে পাঠাই—দেখেছো তো তিনি কত ভাল মানুষ লোক—”

রামপ্রসন্ন। আচ্ছা ডেকে পাঠাও গে যাও।

ধর্ম্মযাজক সন্নিধানে মিত্রজা মনের সকল কথা, সকল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সংশয়ের নিরশন হইতেই যন্ত্রণাও যেন যথেষ্ট কমিয়া গেল—মনে অল্পে অল্পে আরোগ্য হইবার আশাও উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় পেটের ভিতরকার অন্ত্রাদির অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে যথারীতি 'সেক্রামেণ্ট' ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। মিত্রমহাশয় সাশ্রুনয়নে পাদরী সাহেবের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে 'সোফার' উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণের জন্য মনটা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। রামপ্রসন্ন আরোগ্যলাভের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ইতিপূর্ব্বে প্রস্তাবিত উদরদেশে অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিজ মনে বলিতে লাগিলেন—“কাটাইয়া কুটাইয়া কোন রকমে একবার বাঁচিয়া উঠিতে পারিলে হয়। 'সেক্রামেণ্ট' গ্রহণফলে মানসিক অবস্থার আশু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী” এইরূপ একটা কিছু বাঁধা গতের উল্লেখ করিয়া মিত্র-গৃহিণী রামপ্রসন্নের নিকট নিজ অনুরোধ রক্ষা হেতু আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। মিত্রজাকে যেন একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া হিমানী জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেমন আমার কথা সত্য কি না? শরীরটাও মনের সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে ভাল বোধ হচ্ছে না কি?” রামপ্রসন্ন পত্নীর প্রতি ভাল করিয়া না চাহিয়াই শুধু

"হাঁ" বলিয়াই কথা শেষ করিলেন। প্রিয়তমার দেহের ভঙ্গী, মুখের ভাব, গলার স্বর ও পোষাক প্রভৃতি তাঁহাকে সেই একই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। "বাবা এ সবই ঝুটা, বাহিরে যেমন্‌টি দেখ্‌ছ ভিতরে তেমন্‌টি নয়। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার ছলে ভুলিয়া তুমিও নিজের জীবন ঠিক এমনি ধারা করিয়াই কাটাইয়াছ। জীবনে মরণে যেটুকু খাঁটি—যেটুকু সাঁচ্চা, তাহা মোটেই চিনিয়া লইতে পার নাই।

এই চিন্তাটুকু মনে আসিতে না আসিতেই রামপ্রসন্নের আবার সেই পুরাতন বিতৃষ্ণা, সেই দুর্জ্জয় ঘৃণা ফিরিয়া আসিল। ঘৃণার সহিত পূর্ব্বের সেই শারীরিক যন্ত্রণাও যেন কোনও ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হইল। মৃত্যুর নিশ্চয়তা ও নিয়তির অনিবার্য্য গতি সম্বন্ধে মিত্রজার সন্দেহের আর কোন কারণই রহিল না। কেবল মাঝ হইতে আসিয়া জুটিল কয়েকটি নূতন উপসর্গ মাত্র। মধ্যে মধ্যে দম্ আট্‌কাইয়া প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইতে লাগিল—আর বোধ হইতে লাগিল, কে যেন পেটের ভিতরের খানিকটা অংশ টানিয়া, ছিঁড়িয়া, দাঁতে চিবাইয়া জাঁতায় পিষিতেছে।

রামপ্রসন্ন যখন স্ত্রীর কথায় "হাঁ" বলিয়া জবাব দিলেন, সেই সময়ে যন্ত্রণায় তাঁহার মুখ এরূপ বিবর্ণ, এমন পাঙ্গাসপানা হইয়া গিয়াছে যে হঠাৎ দেখিলে যেন মরা মানুষের মুখ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

একবার হিমানীর প্রতি ঋজুভাবে চাহিয়া মিত্রজা নিজের

দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সোফার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন—"যাও যাও, আর তোমরা আমাকে দিক্ করো না।"

১২

রামপ্রসন্ন সেই যে বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিন দিন ধরিয়া তাঁহার আর বিরাম ছিল না। কি ভীষণ সে আর্ত্তনাদ—দশরশি দূর হইতে শুনিলেও পিলা চমকাইয়া যায়। স্ত্রীর প্রশ্নে "হাঁ" বলিয়া জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিত্রসাহেবও স্থির বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই—মৃত্যু সত্য সত্যই তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া। মিত্রজার জীবনের প্রধান প্রশ্নটির সমাধান তখনও হয় নাই এবং শেষ পর্য্যন্তও হইল না। তিনি গেলাম গেলাম শব্দের সহিত হুঁ হুঁ হুঁ না না না দুই বুলিই আওড়াইতে লাগিলেন, দুইয়ের মধ্যে একটা কিছু স্থির করিয়া লইলেন না। তাঁহার জীবনের এই শেষ তিন দিন কালের স্রোত যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোনও অদৃষ্ট অনিবার্য্য শক্তি তাঁহাকে যেন একটা কালো থলিয়ার ভিতর পুরিয়া দিতেছিল, আর মিত্রমহাশয় ধড়ফড়ানি অঙ্গ-বিক্ষেপের দ্বারা তাহারই প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন। বধ্যভূমে আনীত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি তাহার উদ্ধারের আশা নাই বুঝিয়া তবুও যেমন জল্লাদের হাত এড়াইয়া পলাইতে চেষ্টা করে—মিত্রমহাশয়ের এই বাধা দিবার চেষ্টা ঠিক তাহারই অবিকল

অনুরূপ। রামপ্রসন্নের প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল যে অজ্ঞাত জিনিষটিকে তিনি এতাবৎকাল ভয় করিয়া আসিয়াছেন, তাহা যেন ক্রমশঃই তাঁহার কাছের গোড়ায় সরিয়া আসিতেছে। এত প্রতিরোধ চেষ্টা, এত হাত পা আস্ফালন কিছুতেই তাহার গতিরোধ করা যাইতেছে না। মিত্রসাহেব সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই কৃষ্ণবর্ণ থলিয়া'র ভিতরে নিজ দেহ প্রবেশ করাইতে পারিতেছেন না বলিয়াই তাঁহার এই অসহনীয় কষ্টভোগ ঘটিতেছে। কেহ যেন বাহির হইতে তাঁহাকে ভিতরে ঠেলিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, তিনি যে এখনও মনে মনে তাঁহার অতীত জীবন সমর্থন হেতু কতকগুলি পুরাতন সংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। কোন মতেই সে গুলিকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছেন না, ফলে থলিয়ার অপ্রশস্ত মুখে আট্‌কাইয়া গিয়া এই ভ্রান্তি ও অসত্যের বোঝা তাঁহার আগান পিছান দুইই অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। প্রবাদমতে ছুছুন্দর গ্রাস করিতে গিয়া সর্পের যেরূপ ঘটিয়া থাকে তাঁহারও যেন ঠিক সেই অবস্থা। নৈতিক ভ্রান্তির এই সুবিশাল পুঁটুলিটির মায়া গোড়া হইতে বর্জ্জন করিতে পারিলে তাঁহাকে আর এত ভুগিতে হইত না। তৃতীয় দিনে মিত্রমহাশয়ের হঠাৎ মনে হইতে লাগিল কে যেন তাঁহার বক্ষে ও পার্শ্বদেশে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায় যন্ত্রণাও বিশেষভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে—অবশেষে বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি থলিয়ার মুখ দিয়া ভিতরে গলাইয়া আসিয়াছেন। ভিতরের সেই

অতলস্পর্শ গহ্বরের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া ঊষার নির্ম্মলা দীপ্তি যেন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। রামপ্রসন্ন যাহা ভাবিয়াছিলেন এ যেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। রেলগাড়ীতে যাতায়াতের সময় এরূপ ভ্রম অনেকেরই হইতে দেখা যায়। ষ্টেশনে গাড়ী লাগিয়াছে, হয় তো কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছি, প্লাটফরম হইতে গাড়ী পিছনে হঠাইতেছে—কখন চলিতে সুরু করিয়াছে লক্ষ্য করি নাই, হঠাৎ মনে হইল আমরা পূর্ব্বের ন্যায় একপথেই চলিয়াছি, ভাল করিয়া দেখি ওমা তা'তো নয়—এ যে উল্টা গতি!

এই শেষ অবস্থাতেও মিত্রজা আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বলিতেছিলেন—"সংসারপথে না হয় ঠিক মত চলিতে পারি নাই—কিন্তু এখনও ত প্রতিকারের উপায় আছে। ভাল, কি করিয়া চলিলে যে দোষ হইবে না তাহা আজই বা কেমন করিয়া বুঝিব।" রামপ্রসন্ন যেন নিজ অন্তরাত্মার প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষায় নীরব হইলেন।

তখন দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, মুমূর্ষুর দেহত্যাগের মাত্র আর ঘণ্টা দুই বিলম্ব। ছেলেটি কখন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি পিতার কাছে আসিয়া বসিয়াছে। হতাশা প্রপীড়িত রামপ্রসন্ন তখনও যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে হাত পা ছুড়িতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার হাতটি একবার পুত্রের মাথায় গিয়া লাগিল। ছেলেটি যখন সেই শীর্ণ হাতখানি নিজ হাতে ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে খৃষ্টীয় প্রথায় উহা বারংবার

চুম্বন করিতেছিল, ঠিক সেই সময় অহিফেন ঘোরাচ্ছন্ন রামপ্রসন্ন থলিয়ার মুখ পার হইয়া সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভিতর ক্রমশঃ আলোক দেখিতে পাইতেছিলেন, আর গত জীবনের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে সকল সন্দেহ বিসর্জ্জন দিয়া কিসে সেগুলি সংশোধন করা যায় তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। লোকে সংসারে আসিয়া কি নিয়মে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে এই কঠিন প্রশ্নের সমাধান ভরসায় মিত্রজা যখন স্তব্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল কে যেন তাঁহার হাতে চুমা দিতেছে। তিনি চক্ষু খুলিয়াই দেখিলেন ছেলেটি তাঁহার মাথার নিকট হেঁটমুণ্ডে বসিয়া আছে। রোরুদ্যমান অসহায় 'নাবালক'পুত্রের জন্য তাঁহার বড়ই দুঃখ হইতে লাগিল। তাঁহার স্ত্রীও এই সময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলেন। রামপ্রসন্ন চাহিয়া দেখিলেন, হিমানীর নাকমুখ চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। পত্নীর অশ্রুসিক্ত গণ্ডদেশ ও কম্পান্বিত অর্দ্ধবিকশিত ওষ্ঠাধর হঠাৎ যৌবনের প্রেমস্বপ্ন ও আদর অভিমানের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। এতদিনে মিত্রজা সত্যসত্যই সহধর্ম্মিণীর জন্য শোকানুভব করিতে লাগিলেন। একবার মনে হইল "আমার জন্যই উহারা এত কষ্ট পাইতেছে, আমি চলিয়া গেলে বরং স্বস্তি বোধ করিবে।" ইচ্ছা হইল মনের কথা মুখে প্রকাশ করেন, কিন্তু ক্ষমতায় কুলাইল না। রামপ্রসন্ন নিজের সান্ত্বনার জন্য ভাবিতে লাগিলেন, "মিছা মিছি আর এ সব কথা জানিতে দিয়া লাভ কি? ইহাতে ত আর কোন কিছুরই পরিবর্ত্তন হইবে না।" শেষে অনেক

চেষ্টার পর ক্ষীণ ও জড়িতকণ্ঠে বলিলেন—"খোকাকে বাহিরে—তোমার জন্যও কষ্ট—" ইচ্ছা হইল শেষবিদায় গ্রহণকালে প্রাণ খুলিয়া বলেন—"আমি চলিলাম, ক্ষমা কর" কিন্তু মুখ দিয়া বাহির হইল শুধু একটা অর্দ্ধোচারিত শব্দ—'থাক যাই' বা এম্‌নি একটা কিছু। বাক্‌শক্তিহীন রামপ্রসন্ন শুধু হাত নাড়িয়া ইসারা করিলেন —বোধ হয় বুঝাইতে চাহিতেছিলেন "আমি মুখ ফুটিয়া তোমাকে কিছু বলিয়া যাইতে পারিলাম না বটে, কিন্তু যিনি অন্তর্যামী, যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার নিকট কিছুই অপ্রকাশ রহিবে না।"

এখন মিত্রসাহেবের মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইতেছিল যেন শ্রীভগবানের অপার করুণায় তাঁহার প্রকৃতই আস্থা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ্য হেতু তাঁহার এরূপ মানসিক উদ্বেগ জন্মিয়াছিল—যে নিত্য সত্য নির্দ্ধারণের অক্ষমতার জন্য তাঁহার মনঃকষ্টের অবধি ছিল না, এখন, আধ্যাত্মিক জীবনের সেই সকল সত্যগুলি যেন অকস্মাৎ চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহার মনশ্চক্ষুর গোচরে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। রাম-প্রসন্নের মনের যে বিদ্বেষভাব দূর হইয়াছে—এখন যেন সব তাতেই সহানুভূতি। বাটির সকলেই তাঁহার জন্য শোকাকুল—তাই রাম-প্রসন্নের এই শুধু চিন্তা যেন তাঁহার জন্য বাড়ীর অপর সকলের মানসিক কষ্ট অধিক না বাড়িয়া যায়। নিজের দৈহিক কষ্ট নিবারণের ন্যায় প্রিয়জনের দুঃখ নিবারণও যে তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাম-প্রসন্নের মনে হইতে লাগিল—'এপথ যে এত সুন্দর, এত সরল আগে ত তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।' নিজের রোগভোগ প্রসঙ্গে রামপ্রসন্নের

বিষম দৈহিক যন্ত্রণার কথা মনে পড়িল। মিত্রমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন "কৈ এখন আর ত কোনও কষ্ট বোধ হয় না? সে অসহ্য যন্ত্রণাই বা গেল কোথায়? মিত্রজা একবার ভালরূপ মনো-নিবেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া পুনরায় স্বগত বলিতে লাগিলেন— "হাঁ বেদনা যন্ত্রণা এখনও কিছু আছে বটে—কিন্তু তাহাতে আর ক্ষতি কি? রোগের রেশ না হয় একটু থাকিলই বা? কৈ মৃত্যু মৃত্যু করিয়া এত যে ভয় করিতেছিলাম, মৃত্যুই বা গেল কোথায়?" রামপ্রসন্ন নিজের পূর্ব্বকালীন মৃত্যুভীতি ও তন্নিবন্ধন ঘোর দুশ্চিন্তার কথা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৈ মৃত্যুই বা কোথায়, তাঁহার সে ভয়ই বা কোথায়?

মিত্রজা এখন মৃত্যুর কবলাতীত। মরণের অস্তিত্ব কি আর তাঁহার নিকট টিকিয়া থাকিতে পারে; এ সম্বন্ধে ভয় বা চিন্তা কিছুই আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতেছিল না। রামপ্রসন্ন দেখিলেন যমরাজের বিভীষিকার স্থানে এখন অমৃতলোকের চিরন্তন জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে। রামপ্রসন্ন বলিতে লাগিলেন— "তাহাই ত বটে, আগে যে এ সব কিছুই জানিতে পারি নাই! কি আনন্দ! এক মুহূর্ত্তের অপূর্ব্ব সংঘাতেই তাঁহার আত্মার রূপান্তর ঘটিয়াছিল। আত্মীয়জনের চক্ষে তাঁহার শেষ যন্ত্রণা দীর্ঘ দুই ঘণ্টা স্থায়ী বলিয়া মনে হইলেও জীবনের এই মুহূর্ত্তেক ব্যাপী অমৃতের আস্বাদ, অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভূমানন্দের এই অফুরন্ত আবির্ভাব, তিনি মোটেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

মিত্রসাহেবের বুকের কাছে একটা ঘড় ঘড় শব্দ হইতেছিল—

শীর্ণ দেহযষ্টি থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপভরে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ক্রমে সে ঘড়-ঘড়ানি সে খিঁচানি সবই থামিয়া গেল, কে যেন বলিয়া উঠিল "সব শেষ হইয়া গেছে।" রামপ্রসন্ন কথা কয়টি শুনিতে পাইয়া মনে মনে বলিলেন—"মৃত্যুও শেষ হইয়া গেল না কি? তাহা হইলে মৃত্যুরও কি আর অস্তিত্ব রহিল না?"

মিত্রজা পুনরায় একবার গভীর রাত্রে শ্বাস গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উহা ফুস্‌ফুস্‌ হইতে প্রশ্বাসরূপে আর বাহির হইতে পারিল না। দেহখানি আপনা হইতেই এলাইয়া পড়িল, রামপ্রসন্নের প্রাণপাখী এবার সত্য সত্যই দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিল।

সমাপ্ত
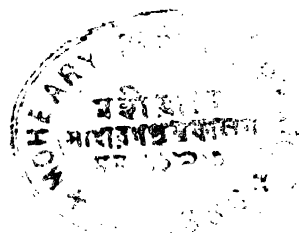
আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে— সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গ সাহিত্যের বাহুল্য প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট আনা সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি। মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

মফঃস্বল-বাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৶৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে; প্রকাশিত গুলি একত্রে লইতে হয় বা পত্র লিখিয়া সুবিধানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ লইতে পারেন।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
পল্লীসমাজ (৫ম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
বিবাহবিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।
দুর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
শাশ্বত-ভিখারী (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
বড় বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
অরক্ষণীয়া (৩য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।